care
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
gsk
do more
feel better
live longer
যেভাবে তারা
স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হলেন
প্রেক্ষাপট: সুনামগঞ্জ
দোরগোড়ায় অত্যাবশ্যকীয় দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা
৩০০ জন নারীর স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হিসেবে
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

যেভাবে তারা

স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হলেন

প্রেক্ষাপট: সুনামগঞ্জ

দোরগোড়ায় অত্যাবশ্যকীয় দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা

৩০০ জন নারীর স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হিসেবে
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

গ্রন্থস্বত্ব সতর্কীকরণ: স্বাস্থ্য উদ্যোক্তাদের গল্প নিয়ে এই বইটিতে প্রকাশিত মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি- কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। গ্লাক্সোস্মিথক্লেইন বা বাংলাদেশ সরকার কোনভাবে এর দায়ভার বহন করে না।

আরও তথ্যের জন্য
এইচআরএম ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডাঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
প্রোগ্রাম ডিরেক্টর-হেলথ, কেয়ার বাংলাদেশ
Email: Jahngir.Hossain@care.org

রুমানা আহমেদ
হেড অব কমিউনিকেশনস, গ্লাক্সোস্মিথক্লেইন, বাংলাদেশ
বাড়ি ২এ, রোড ১৩৮, গুলশান ১
ঢাকা- ১২১২, বাংলাদেশ
Email: rumana.r.ahmed@gsk.com

প্রকাশনা ২০১৯

প্রচ্ছদ ছবি
তাপস পাল/কেয়ার বাংলাদেশ

প্রকাশনা
কেয়ার জিএসকে সিএইচডব্লিউ ইনিশিয়েটিভ, কেয়ার বাংলাদেশ
রাওয়া কমপ্লেক্স (লেভেল: ৭-৮)
ভিআইপি রোড মহাখালি, ঢাকা-১২০৬, বাংলাদেশ
www.carebangladesh.org

ডিজাইন এবং মুদ্রণ
দৃক
www.drik.net

ফটো: তাপস পাল/কেয়ার বাংলাদেশ

পরিচিতি

পরিচিতি

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কেয়ার একটি বৃহৎ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান। দারিদ্র পীড়িত কমিউনিটির মানুষকে সহযোগীতার মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নয়ন এবং দারিদ্র অবস্থা থেকে বের করে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি বর্তমানে ৯৩টি দেশে প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সহযোগীতা করছে এবং সেই সময় থেকে কেয়ার নারী ও কিশোরী বয়সীদেরকে কর্মসূচীর কেন্দ্র বিন্দুতে রেখেছে।

নারীর ক্ষমতায়নে কেয়ার বাংলাদেশের কৌশল/পন্থা সমূহ

আমরা জানি যে নারী ও কিশোরী বয়সীদের জীবন চরমভাবে দারিদ্রতা, বৈষম্য ও সহিংসতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে জন্যই আমরা প্রান্তিক নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে সব জায়গায় গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতাকে বিকশিত করার জন্য সমাজের ক্ষতিকারক রীতি ও চর্চা নির্মূল করতে কমিউনিটির সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং পুরুষ ও বালকদেরকে সম্পৃক্তকরণের কাজকে কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছি। জেন্ডার সমতাকে মুলধারায় নিয়ে আসতে এবং নারীর সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে নতুন নতুন গবেষনার মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে এডভোকেসীর কাজ চলমান রেখেছে।

কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ এবং নারী স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা উদ্যোগটির পরিচিতি

কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ এবং স্বাস্থ্য সেবার ঘাটতি পূরনে একটি অভিনব পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ। যা সুনামগঞ্জের ১১টি উপজেলায় ২৮ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্য ঘাটতি পূরণে কাজ করছে। ২০১২ সালের ডিসেম্বর থেকে ৩০০ জন প্রাইভেট দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা কর্মীকে স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে উন্নয়ন বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আর এই উদ্যোগটিকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে গ্লাক্সোস্মিথক্লেইন তাদের ২০% লাভের বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালার ভিত্তিতে। কমিউনিটি, সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্থানীয় সরকার এই প্রাইভেট সেবাদানকারীদের বিভিন্ন সহযোগীতা দিয়ে যাচ্ছে।

দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্য উদ্যোক্তাদের পরিচিতি

স্বাস্থ্য উদ্যোক্তাদের মূলত স্থানীয় পর্যায়ের এসএসসি পাশ করা বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে থেকে বেছে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নার্সিং কাউন্সিল কতৃক স্বীকৃত ছয় মাসের আবাসিক প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষনে যাওয়ার আগে প্রত্যেক নির্বাচিত প্রশিক্ষনার্থীদের নিজ নিজ স্থানীয় সরকারের সাথে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে সমন্বিত শিশুরোগ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রশিক্ষন সমূহ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিটির চাহিদা, চ্যালেঞ্জ ও শিখন থেকে গত তিন বছরে আরো কিছু দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন যোগ করা হয়েছে। যেমন পরিবার পরিকল্পনা, চোখ পরীক্ষা ও রেফারেল, বিভিন্ন প্যাথলজিকেল টেষ্ট যেমন রক্তের হিমোগ্লবিন, প্রসাব পরীক্ষা ইত্যাদি যা তাদেরকে বহুমুখী স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে তাদের কমিউনিটির পুরো একটি পরিবারের প্রাথমিক/ সাধারন রোগের চিকিৎসা সেবা দিতে সক্ষম। ফলে তাদের সেবা প্রদান এখন শুধুই মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে, তাইতো তারা এখন প্রাইভেট সিএসবিএ থেকে বহুমুখী প্রাইভেট দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। এগুলো তাদের মধ্যে বাড়তি আয়ের পথ তৈরী করছে। এই স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের স্থায়িত্বশীলতার মূলে রয়েছে ক্রমাগত স্বাস্থ্য সেবার উৎকর্ষতা ও দরিদ্র পরিবারকে সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিশ্রুতি। প্রত্যেক স্বাস্থ্য উদ্যোক্তার কমপক্ষে ৭৫০০ জনগোষ্ঠীর একটি মার্কেট (সাধারনত একটি ইউনিয়নে তিন জন করে) রয়েছে। আর এ কাজে ১০ জন করে স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রত্যেক দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীকে সহায়তা করছে । বিভিন্ন অভিনব পন্থায় প্রত্যেকে স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিক্রি করছে মানুষের দোরগোড়ায় গিয়ে। এই ধরনের একটি চ্যালেঞ্জিং পেশায় টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে গুরুপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কমিউনিটি, অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী ও পরিবারের স্বপ্রনোদিত সহায়তা নিশ্চিত করা।

নারী স্বাস্থ্য উদ্যোক্তাদের গল্প

প্রকাশনার প্রেক্ষিত

প্রত্যেক গল্পের কিছু বিশেষ মূহূর্ত থাকে যখন তার নায়ক পরিবর্তনের আনিচ্ছাকে জয় করে বা অতিক্রম করে। সাধারন বা প্রাত্যহিক জীবন যাপনকে অতিক্রম করে বিশেষ একটি কাঙ্খিত পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য দঃুসাহসিক কিছু পদক্ষেপ নেয়। সেই কাঙ্খিত পৃথিবীতে নায়ক দক্ষতা ও অন্তরদৃষ্টি লাভ করেন। গল্পের শেষে তিনি অসাধারন বিষয়গুলোকে সাধারন করে তোলেন।

সত্যি কথা বলতে কি আমরা স্থানীয় এই নারী স্বাস্থ্য উদ্যোক্তাদের গল্পগুলোতে বিশেষ মূহুর্তগুলোকে ধরার চেষ্টা করেছি যা সুনামগঞ্জের প্রেক্ষিতে একজন নারীর জন্য সত্যিই দু:সাহসিক! কারো ক্ষেত্রে কোলের ছোট শিশু, কারো ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, কারো বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কঠোর নিয়ম, এই গল্পগুলো সেই সব কঠিন মুহূর্ত অতিক্রম করে একটা কাঙ্খিত পৃথিবীতে অন্তরদৃষ্টি লাভ করার মতোই -সেই অন্তর দৃষ্টি আর অভিজ্ঞতাগুলোকে শেয়ার করতে চেয়েছি এই ২০ জন প্রান্তিক নারীর গল্পের মধ্যে দিয়ে যা তাদেরকে নারী স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরী করে একটি নতুন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে সুনামগঞ্জের ৩০০ জন স্বাস্থ্য উদ্যোক্তার জীবনকে আমরা খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখেছি ধীরে ধীরে কি ভাবে তারা একেকজন দক্ষ স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারী হয়ে উঠেছেন, এগিয়ে গেছেন ক্ষমতায়নের দিকে, তৈরী হয়েছে আত্ম মর্যাদাবোধ, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রন সহ আর্থিক ভাবে সামর্থ্যবান এবং পেয়েছেন সামাজিক প্রতিষ্ঠা। এখানে আমরা তাদের এই পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত কারনগুলো খোঁজার চেষ্টা করেছি তাদের বাস্তব জীবনের গল্পের মাধ্যমে। যেখানে প্রত্যেকের পরিবর্তনের গল্পের রয়েছে এক একটি ভিন্ন মাত্রা।

আমাদের প্রত্যাশা গল্পগুলো পাঠক ঐ সব প্রান্তিক নারীদের বিভিন্ন সমস্যা আর বাঁধা অতিক্রম করে তাদের বৃহৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কি ভাবে একেক জন স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হয়ে উঠলেন তা বুঝতে সহায়তা করবে। আমাদের বিশ্বাস এই গল্পগুলো উন্নয়ন কর্মীদের নারী স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা তৈরীর আরো অভিনব নতুন মডেল তৈরীতে সহায়তা করবে যা দূর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা ঘাটতি পূরনে কমিউনিটির সামর্থ বাড়িয়ে তুলবে।

এখানে সব গল্পগুলো সফলতার নয়, বরং স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা তৈরী হয়ে উঠার পথে কিছু কিছু ব্যর্থতা আর তা অতিক্রমের চেষ্টা, সামর্থ্য দিয়েছে বাড়তি নাটকীয়তা। এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে বিভিন্ন বাঁধা আর সমস্যার সাথে সংগ্রাম করে স্থায়িত্বশীলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল ও মাইল ফলকগুলো।

পাঠক হিসেবে একটা অনুরোধ যে গল্পের মধ্যে সামগ্রিক উদ্যোগ বা প্রকল্পটিকে খোঁজার চেষ্টা না করা।

বরং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন পরিবর্তনের নানা মাত্রার বিশ্লেষন সহ, কিভাবে একজন নারী তার আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন তা অনুধাবন করা। আশা করছি এই নারী উদ্যোক্তারা অন্যদের জন্য রোল মডেল হবে বিশেষ করে ক্ষতিকারক সামাজিক রীতি ও চর্চাকে চ্যালেঞ্জ করে গ্রহনযোগ্যতা তৈরীর ক্ষেত্রে।

সব শেষে মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে , এই ৩০০জন স্বাস্থ্য উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় ৫০ভাগ মানুষের অত্যাবশ্যকীয় দক্ষ স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছে । দেশের আরো দশটি দূর্গম পিছিয়ে পড়া জেলার প্রায় এক কোটি মানুষের অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্যে এই ধরনের স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা তৈরীতে আপনার সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন।

সূচিপত্র

০৮

১০

১২

১৪

১৬

১৮

২০

২২

২৪

২৬

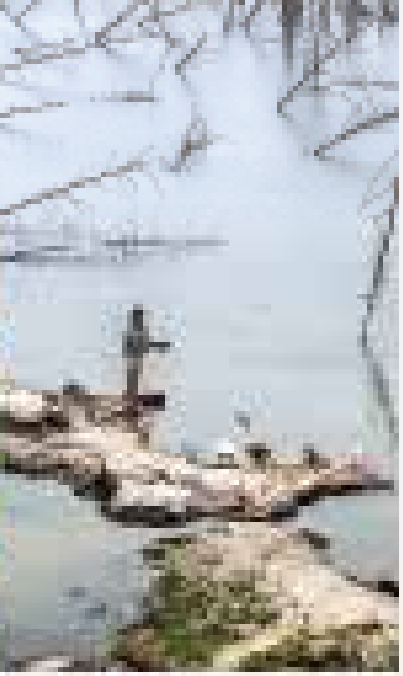

২৮
৩০
৩২
৩৪
৩৬
৩৮
৪০
৪২
৪৪
৪৬

শিল্পী

বাড়ী ছেড়ে অনেক দূরে ছয় মাসের আবাসিক প্রশিক্ষণ নেয়ার নেপথ্যে।

মাঝখানে ছুটিতে বাড়ী আসলে তার কোলের শিশুটি তাকে চিনতে পারছিলনা, এতটাই হতাশ হয়েছিলেন যে আর প্রশিক্ষণে ফিরে যেতে চাননি।

তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের বাসিন্দা শিল্পী রানী তালুকদার (২৯)। স্বামী বাদাঘাট বাজারে সামান্য বেতনে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। শিল্পী স্থানীয় একটি এনজিওর পুষ্টিকর্মী হিসেবে কাজ করে মাসে ১,৪০০ টাকা রোজগার করেন। সামান্য আয়ে অভাব-অনটনে চলে তাদের সংসার। ২০১৬ সালে কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ্ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ বা প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারেন । তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন তবে সঙ্কটে পড়েন তার কোলের শিশুটিকে নিয়ে। এক বছর বয়সের বাচ্চাকে রেখে কিভাবে প্রশিক্ষণ নেবেন শিল্পী রানী তালুকদার? এই দোদুল্যমানতার ভিতরেই ছয় মাস মেয়াদী প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করেন।

অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত বাচ্চাকে সাথে নিয়েই নেত্রকোনা নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চতুর্থ ব্যাচে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। কিন্তু কয়েকদিনেই বুঝতে পারেন, ছোট বাচ্চা সাথে নিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা অসম্ভব। তাই মনের বিরুদ্ধে গিয়ে বাচ্চাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পরে তিনদিনের ছুটিতে যখন বাড়িতে আসেন, তখন বাচ্চা তাকে প্রায় চিনতেই পারেনি, তখন এতটাই কষ্ট পেয়েছিলেন যে আর ফিরে যাবেন না নার্সিং ইন্সটিটিউটে। কিন্তু তিনদিন পর পরিবারের সবার পরামর্শ আর আশ্বাসে নিজেকে সামলে নিয়ে আবারও ফিরে গিয়েছিলেন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

প্রশিক্ষণ শেষ করে নিজের কর্মএলাকায় এসে মনে হয়েছিল এই কাজ করতে পারবেন না তিনি। কিন্তু প্রথম ডেলিভারীর অভিজ্ঞতা সব বদলে দিল। এক সপ্তাহ যেতে না যেতে একদিন রাত বারোটায় ফোনে ডাক পড়ল। স্বামী, শ্বাশুড়ি আর একজন স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী মিলে রওনা হলেন কামড়া বন্দ গ্রামের দিকে। রাত সাড়ে তিনটায় ডেলিভারী সফলভাবে সম্পন্ন হয়। শেষরাতে বাড়ি ফিরলেন ১,৫০০ টাকা নিয়ে। কাজের মূল্য পেয়ে নিজের পুরোনো সব কষ্ট ভুলে গেলেন। পরের দিন আবার নোনাই গ্রামে গিয়ে রাত দশটায় একটা ডেলিভারী করালেন। শিল্পী রাণী হাতে গ্লোভস পরে সব কাজ সম্পন্ন করলেন, স্যালাইন দিলেন,বাচ্চার নাড়িতে ঔষধ সহ একটা ক্লিপ লাগিয়ে দিলেন, পেঙ্গুইন সাকার মেশিন দিয়ে বাচ্চাকে পরিষ্কার করলেন। সেবাগ্রহীতা পরিবারের লোকেরা তার ডাক্তারসুলভ কর্মকান্ড দেখে রীতিমত অবাক। তারা ধাত্রী আর দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর ভিতরকার পার্থক্য অনুধাবন করে সবাই একযোগে শিল্পীর প্রশংসা আর প্রচার শুরু করে দিলো।

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

এরপর নিজের কর্ম এলাকায় আরো প্রচারের জন্য অন্য এনজিওর ৫-৬ জন পুষ্টিকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীকে তার মার্কেটিং এর কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। যখন যেখানে সেবার প্রয়োজনে জরুরী খবর আসে, শিল্পী রানী ঠিকই পৌঁছে যান। এলাকায় মোট ১০ জন স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী তাকে বিভিন্ন সময়ে খবর পাঠান; সেবামূল্য থেকে শিল্পী তাদের কিছু টাকা দেন। রাতের বেলায় স্বামী তাকে সাথে করে নিয়ে যান।

তিনি আরো বলেন, 'বাদাঘাট গ্রামের ঝুমা নামে এক মায়ের ডেলিভারীর সময় জটিলতার কারণে বাড়ীতে স্বাভাবিক প্রসবের সম্ভবনা না দেখে নিয়ে যাই সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে, দুদিন পরে মা ও শিশু সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলে পরিবারটি খুব খুশি হয়। এছাড়াও বাদাঘাট বাজারের বাজার কমিটি ও এলাকাবাসী একজন হতদরিদ্র প্রতিবন্ধী মায়ের ডেলিভারী করার জন্যে আমার খুব প্রশংসা করে এবং সবরকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে আমার প্রচার করে।' স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার মাঠপর্যায়ের কর্মীরা তাকে সার্বক্ষণিক গর্ভবতী মায়েদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করছেন। এলাকার সংশ্লিষ্ট সবাই মিলে একটা দলের মত কাজ করেন। এভাবে তার কর্ম এলাকায় মাসে ১০-১৫ টি ডেলিভারী সহ অন্যান্য সেবাপ্রদানও করছেন শিল্পী রানী তালুকদার।

এখন তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন, প্রশিক্ষণে যাওয়ার সিদ্ধান্তটাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত, মাঝে মাঝে প্রশিক্ষন কেন্দ্রে তার কর্মকান্ডের স্মৃতিচারণ করেন- একদিকে নিয়ম করে পড়াশোনা আর অন্যদিকে পরিবারের জন্যে মন খারাপ হওয়া, দেখতে দেখতে কখন যে ছয় মাস কেটে যায় তিনি টেরই পাননি। এখন যত দিন যাচ্ছে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বাড়ছে, সেবার সম্প্রসারণের সাথে সাথে বাজারের সাথে লিংক করে মান সম্মত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সহ প্রয়োজনীয় ঔষধ পৌঁছে দিতে পারছেন সেবাগ্রহীতার দোরগোড়ায়। এরই সাথে বাড়ছে রোজগার আর রোজগার বাড়ার সাথে সাথে সংসারে এসেছে স্বচ্ছলতা, তিনি নিজের এবং পরিবারের সামাজিক সম্মানও প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

এখন তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন, প্রশিক্ষণে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটিই ছিল সঠিক।

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

সীমা

সত্যিকার অর্থেই বেতনভুক্ত চাকুরি আর উদ্যোক্তার পার্থক্যটি স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন।

তবে সীমা চন্দের প্রাইভেট কমিউনিটি দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী হয়ে ওঠার গল্পটি ঠিক অতটা সরলরৈখিক ছিল না।

সুনামগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত একটি উপজেলা জামালগঞ্জ। এই উপজেলার আরো প্রত্যন্ত এক গ্রাম কামলাবাজ। বর্ষাকালে চারপাশ পানিতে নিমজ্জিত থাকে । হাঁটা পথ শেষ হলে সেবাগ্রহীতাদের বাড়ি পৌঁছাতে নৌকাই একমাত্র ভরসা। লাইনের নৌকা কখন আসবে তার কোন ঠিক নেই। আর রাতের বেলা হলে তো কথাই নেই, বলতে গেলে একরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এমন দূর্গম এলাকায় প্রসূতি মায়েদের ডেলিভারীর জন্য কোনো ডাক্তার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ব্যতিক্রম সীমা চন্দ (৩৫), তিনি একজন প্রাইভেট দক্ষ কমিউনিটি প্রসবকালীন সেবাদানকারী বা প্রাইভেট সিএসবিএ (প্রাইভেট কমিউনিটি স্কিল্ড বার্থ এটেন্ডেট) নিজের পেশাগত দায়িত্বে সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ঠিকই পৌঁছে যান মায়েদের প্রসবকালীন সেবা প্রদান করতে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রামের একজন মুরুব্বী যথার্থই বলছিলেন, 'গ্রামের দাই ডেলিভারী করার পরপরই যেভাবে রক্ত যাচ্ছিলো, সেই রাতে এই ডাক্তার বেটি (সীমা চন্দ) যদি না আসতো তাহলে আমরার বাড়ির বৌ আর বাচ্চা কেউই বাঁচতো না।'

তবে সীমা চন্দের প্রাইভেট দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী হয়ে ওঠার গল্পটি ঠিক অতটা সরলরৈখিক ছিল না। কাজটি জনহিতকর সন্দেহ নেই, তবে আর্থিকভাবে কতটা ফলপ্রসু হবে সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। উপরন্তু রাতবিরেতে ডেলিভারীর ডাক আসলে প্রত্যন্ত হাওড় অঞ্চলে একজন নারীর জন্য চলাফেরা করা রীতিমত ছিল বিপজ্জনক। অনেকটা অজানা পথে পা বাড়ানোর মত। রাতের অন্ধকার, অথৈ পানি, আর্থিক অনিশ্চয়তা সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে সীমা এখন একজন সফল প্রাইভেট দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি তিনি এখন পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম সদস্য।

জামালগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা সীমা চন্দ, স্বামী বাজারেই দর্জির কাজ করেন। স্থানীয় এনজিও তে কাজ করতেন সীমা। এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করে মাসে মাত্র ৪,০০০ টাকা উপার্জন করতেন। কিছুদিন পর এই কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তিনি চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েন। ঠিক এই সময়ে কেয়ার পরিচালিত এই প্রকল্পের খোঁজ জানতে পারেন।

সুনামগঞ্জের দুর্গম এলাকায় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব পূরণে 'কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ্ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ' প্রকল্পে ছয় মাস মেয়াদি 'প্রাইভেট দক্ষ কমিউনিটি প্রসবকালীন সেবাদানকারী' হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। সীমা চন্দ ২০১৪ সালে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কাজ শুরু করেন। প্রাইভেট সিএসবিএ হিসেবে কাজ শুরু করার প্রথম দিকে মনে হয়েছিল তিনি একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চাকরিতে মাস শেষে নির্দিষ্ট বেতন পাওয়া যেত, আর এখন নিজের দক্ষতায় সেবা বিক্রি করে রোজগার করতে হয়। এই কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব মনে হয়েছিল কারণ প্রথম দিকে কেউই সেবা নিতে

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

চাইতো না, অনেকে সেবা নিয়ে সেবামূল্য পরিশোধ করতে গড়িমসি করতো। কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ্ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী ২০১৬ সালের মে মাস থেকে প্রকল্প থেকে সম্মানি ভাতা দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সীমা কাজ চালিয়ে যেতে নিরুৎসাহিত বোধ করতে থাকেন।

এ সময় প্রকল্প থেকে সামাজিক উদ্যোক্তা বিষয়ক তিন দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। সেবা সম্পর্কে এলাকাবাসীর কাছে প্রচারের জন্য উপায় খুজতে শুরু করেন। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর চাকুরি করার সময় সীমা চন্দের কর্ম এলাকায় ১৯ টি সমিতি ছিলো; সেই সমিতি গুলোকে মার্কেটিং নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসেন। ইউনিয়ন পরিষদ জনস্বার্থে নিজেদের বাজেট থেকে প্রচারের জন্য সাইনবোর্ড ও ফেষ্টুন তৈরি করে দেয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা গ্রাম ডাক্তার ও ধাত্রীকে রাজি করিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে সহযোগিতা করেন। ধীরে ধীরে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা ও সেবা দানকারীদের সাথে সুসম্পক তৈরি হয়। তিনি জটিল রোগীদের নিরাপদ প্রসবের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন।

পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও তার ভূমিকা এখন লক্ষণীয়। কথা প্রসঙ্গে সীমা চন্দ জানান, 'স্বামী ও পরিবারের সদস্যরা এখন বিভিন্ন রকমের সহায়তা করে। যেমন: রান্না করে, বাজার থেকে ঔষধ এনে দেয়, বাচ্চাদের পড়ালেখা দেখাশোনা করে, রাতের বেলা ডেলিভারীর ডাক আসলে আমার স্বামী আমাকে সাথে করে নিয়ে যায়। এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা আর সংসারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দুটোই বেড়েছে। আমার স্বপ্ন বাচ্চা দুটোকে পড়াশোনা করিয়ে অনেক বড় করব, এখন সীমা চন্দের কাছে এই কাজকে মোটেই চ্যালেঞ্জিং মনে হয় না। তিনি প্রতি মাসে ৭-৮টি করে প্রসব সেবাসহ বিভিন্ন রকমের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে মাসে গড়ে ১০-১৫ হাজার টাকা রোজগার করেন। তিনি বলেন এই রোজগার চাকুরির থেকে অনেক বড়, মানুষের উপকার করতে পারছি আর সংসারেও স্বচ্ছলতা এসেছে।'

আমার দক্ষতা আর সেবা প্রদানের জন্যে আজকে আমি এলাকায় পরিচিত। চাকুরি ছেড়ে এই পেশায় আসার সিদ্ধান্তকে এখন আর ভুল মনে হয় না।

আজ আমার দক্ষতা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য মানুষ আমাকে এক নামে চিনে – তৈরী হয়েছে একটি ভিন্ন পরিচিতি, যা সীমিত আয়ের চাকুরির থেকে অনেক গুণে ভালো।

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

খোদেজা

খোদেজার স্বপ্ন সত্যি হওয়ার গল্প।

দারিদ্রপীড়িত পরিবারে জন্ম নেয়া খোদেজার স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন আর স্বপ্নের পিছনে ছোটার ইচ্ছা থেমে থাকেনি।

সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু নিয়মিত ঘটনা। যেকোন রোগে একমাত্র ভরসা হয় ধাত্রী নয়তো গ্রাম্য ডাক্তার। ছোটবেলায় এই গ্রাম্য ডাক্তারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে চিকিৎসা করা দেখে বড় হয়েছেন খোদেজা আক্তার (২২) । ডাক্তারের গলায় ঝোলানো স্টেথোস্কোপের প্রতি ছোটবেলার আগ্রহ থেকেই বড় হয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন খোদেজা। দারিদ্র্য সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। কিন্তু অমন হাওড় অঞ্চল থেকে দরিদ্র ঘরের কোনো নারীর পক্ষে ডাক্তার হওয়া সম্ভব ছিল না। দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারে জন্ম নেয়া খোদেজা আক্তারের বিয়ে হয় ৮ম শ্রেণীতে পড়ার সময়। তবু স্বপ্নের পিছনে ছোটার ইচ্ছা থেমে থাকেনি।

বিয়ের পর পড়ালেখার স্বপ্নভঙ্গের সাথে অপ্রাপ্ত বয়সে সংসার সামলানোর চাপ এসে পড়ে কিশোরী খোদেজার উপর। এদিকে তার স্বামীর আয় রোজগারও তেমন ভালো না। সেই কিশোরী বয়সেই ভাবলেন সংসারের অভাব দূর করতে ঢাকা গিয়ে গার্মেন্টসে কাজ করলে কেমন হয়! কিন্তু লোকমুখে গার্মেন্টসের কাজ সম্পর্কে শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। জানলেন সেখানে অনেক পরিশ্রম আর অনিশ্চয়তা, তখন মনে হল যেভাবেই হোক এসএসসি পাশ করবেন। এরকম একটি অঞ্চলে এই ধরণের দরিদ্র পরিবারে বিয়ের পর মেয়েদের পড়ালেখা করা অত্যন্ত কঠিন। খোদেজা আক্তার তার স্বামী ও শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে বুঝিয়ে রাজি করাতে সক্ষম হলেন। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ভালো গ্রেড নিয়ে এসএসসি পাশ করেন।

এসময়ে তিনি দূর সর্ম্পকের এক মামার মাধ্যমে কেয়ার জিএসকে পরিচালিত কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ এর প্রাইভেট সিএসবিএর প্রশিক্ষন কর্মসূচী সম্পর্কে জানতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষনের প্রশিক্ষনার্থী বাছাই পরীক্ষায় নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালে প্রাইভেট সিএসবিএ হিসেবে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন যা বাংলাদেশ সরকারের নার্সিং কাউন্সিল কতৃক স্বীকৃত। প্রশিক্ষণ শেষে নিজের বাসস্থান ধর্মপাশা উপজেলার গারো পাহাড়ের পাদদেশে সীমান্তবর্তী উত্তর বংশীকুন্ডা ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামে ফিরে কাজ শুরু করেন। তখন এই অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও শিশুরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত ছিল। যার ফলে গ্রামে ফিরে এসে আর বসে থাকতে হয়নি। দিন-রাত, ঝড়-র্বষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে ছুটে বেড়ানো শুরু করেন গ্রাম থেকে গ্রামে। কিশোরী বয়সীদের কাছে পৌঁছে দেন ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী, অথবা দম্পতিদের চাহিদা অনুযায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী- এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন সরকারের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ থেকে যে সব পদ্ধতির উপরকরণ সরবরাহ হিসেবে পান তা বিনা পয়সায় গ্রহীতাদের মধ্যে

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

বিতরণ করেন আর যারা অন্যান্য কোম্পানীর বিশেষ করে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানীর পদ্ধতি উপকরণ কিনে নিতে চান তাদের কাছে তিনি বিক্রি করেন, এরই মধ্যে সেবা সম্প্রসারণের উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ পরীক্ষা করে সেবাগ্রহীতাদের পরামর্শ ও রেফারেল সেবা প্রদান করছেন। এভাবেই প্রতিনিয়ত তার সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। খোদেজা হয়ে উঠেছেন এলাকার মানুষের ভরসাস্থল, সবার কাছে তিনি এখন প্রিয় 'স্বাস্থ্য আপা' একজন প্রাইভেট দক্ষ স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারী ।

ইতিমধ্যে কর্মএলাকায় প্রায় ৮,০০০ জনসংখ্যার ১০০% গর্ভবতী মায়েদেরকে রেজিস্ট্রেশন এর আওতায় নিয়ে এসেছেন। ৬০% ডেলিভারী করানোর কাজ একাই করছেন, যা এখন পর্যন্ত প্রাইভেট সিএসবিএ-দের মধ্যে সর্বোচ্চ। এসবের বিনিময়ে তার মাসিক আয় এখন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আগে আমার পরিবার শুধু স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। এখন আমি আয় করে সংসারে অবদান রাখতে পারছি। সেই সাথে পরিবারের অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারছি যা আগে পারতাম না।' সংসার খরচের পাশাপাশি খোদেজা তার আয় থেকে একমাত্র ছেলের পড়ালেখার খরচও চালাচ্ছেন। নিজের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন এখন তিনি সন্তানকে দিয়ে পূরণ করতে চান।

কঠোর পরিশ্রম, সেবা আর সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৫ সালে খোদেজা আক্তার স্থানীয় সরকার এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভাগ থেকে উত্তর বংশীকুন্ডা ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ সফল নারী হিসেবে সম্মানজনক জয়িতা পুরস্কার লাভ করেন। নিজের সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে খোদেজা আরো বলেন, 'কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার সফলতার পেছনে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি।'

ডাক্তার হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু যোগ্যতা বলে স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে তার দূর্গম কর্মএলাকায় মানুষের জীবন রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিরন্তর যে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তা ডাক্তারের থেকে কম কিসে ? এখন আমি জানি আমার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে, আমার মত অন্যান্য নারীদেরও তাদের স্বপ্নের ব্যপারেও বিশ্বাস থাকা দরকার।

ডাক্তার না হতে পারলেও দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে তার কর্ম এলাকার শতভাগ গর্ভবতীকে সরকারের রেজিস্ট্রেশনের আওতায় নিয়ে এসেছেন।

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

অর্পণা

অনেক কঠিন মূল্যে অর্পণার স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হয়ে উঠা।

অক্টোবর মাস ২০১৭ সাল। অর্পণার স্বামী নিজ নৌকায় ভাড়ায় যাত্রী নামিয়ে ফেরার পথে মাঝ হাওড়ে ঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়।

অর্পণা রাণী তালুকদার এর (২৩) সংগ্রামের চিত্রটি সবার থেকে আলাদা। যতবারই উঠে দাঁড়িয়েছেন, ততবারই হোঁচট খেয়েছেন। যে স্বামীর হাত ধরে গ্রামে ফিরে নতুন আশায় বুক বেঁধেছেন, কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ এর দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরীর প্রকল্পকে আঁকড়ে ধরে, ঠিক মাঝপথে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় সেই মানুষটি পাড়ি জমান না ফেরার দেশে। স্বামীহারা অবস্থায় উঠতি ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে আক্ষরিক অর্থেই দিশেহারা হয়ে পড়েন অর্পণা। ঠিকই উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি আবার। ফিরে গেছেন গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের সেবাদানে। গল্পটা প্রথম থেকে শুরু করা যাক।

কেয়ার জিএসকে সি এইচ ডাব্লিউ ইনিশিয়েটিভের প্রাইভেট দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরী প্রকল্পের উদ্যোগে, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত ছয় মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্পণা ফিরে আসেন নিজের গ্রামে। জামালগঞ্জ উপজেলার ফেনারবাঁক ইউনিয়নের দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশে রাধানগর গ্রামে স্বামী আর দুই সন্তান নিয়ে তার সংসার। কাজ শুরু করার পর যোগাযোগের সমস্যাই প্রধান প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় প্রাইভেট সিএসবিএ অর্পণার। এই এলাকা বর্ষাকালে প্রায় ছয় মাস পানিতে ডুবে থাকে। পানিবন্দি এসব এলাকায় বর্ষার সময়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রাম থেকে গ্রাম প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এসময়ে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ভাড়া নৌকা। ভাড়া নৌকায় যাতায়াতের খরচও হয় অনেক বেশি। প্রথম দিকে রাতে সেবাপ্রদানের প্রয়োজনে ভাড়া নৌকা না পাওয়ায় স্বাস্থ্য সেবাপ্রদান করা প্রায় অসম্ভবই হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে অর্পণার কর্মএলাকায় প্রতিমাসে ৯-১০টি ডেলিভারী হয়। দক্ষ স্বাস্থ্য সেবাকর্মী না থাকায় এসব ডেলিভারী সম্পন্ন হয় অদক্ষ গ্রাম্য ধাত্রীদের তত্ত্বাবধানে।

এ অবস্থায় কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভকে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরী প্রকল্প প্রতিনিধিদের পরামর্শে যোগাযোগ সমস্যা সমাধানে স্বামী একটি নৌকা কিনলেন। পরিবারের সামান্য সঞ্চয় এবং স্থানীয় এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে নৌকা কেনা হয়। সেই নৌকায় জরুরি প্রসবসেবার প্রয়োজনে অর্পণার স্বামী তাকে সেবাগ্রহীতাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। আর বাকি সময়ে ভাড়ায় যাত্রী পারাপার করতেন। এতে তার স্বামীর কর্মসংস্থান এবং অর্পণার যোগাযোগ সমস্যার সমাধান হয়ে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এভাবেই ধীরে ধীরে অর্পণার সেবাপ্রদানের গ্রাহক বেড়েছে। তিনি সংক্রামক ও

ফটো: তাপস পাল/কেয়ার বাংলাদেশ

অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা প্রদান ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিক্রি করাও শুরু করেছিলেন। সব মিলিয়ে এসময় পরিবারের মাসিক আয় ছিল গড়ে প্রায় ৭০০০ টাকা।

এরপর ভয়াবহ বিপদ নেমে আসে অর্পণার জীবনে। ২০১৭ এর অক্টোবর মাসে অর্পণার নিজের পেশার প্রয়োজনে কেনা নৌকায় করে যাত্রী নামিয়ে ফেরার পথে ঝড়ের কবলে পড়েন তার স্বামী।

শেষ মুহূর্তে অর্পণাকে মোবাইল ফোনে দুর্ঘটনার কথা জানাতে সক্ষম হন স্বামী। এরপর ফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুর্গম হাওড়ের কোন এক অজ্ঞাত স্থানে অর্পণার স্বামীর নৌকা ডুবে যায়। একদিন পর স্বামীর লাশ পাওয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় যে কোন নারীর মত অর্পণাও ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যাননি। বাবাহারা দুই সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে অপণা ফিরে আসেন নিজের পেশায়। এ মহাবিপদের সময় তিনি পাশে পেয়েছেন উপজেলা ও ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিনিধি, সুধীজন ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে।

স্বামীর এই অকাল মৃত্যু অর্পণাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু থেমে যাননি তিনি। উপজেলার সকল প্রাইভেট সিএসবিএ এগিয়ে এসেছেন অর্পণার সাহায্যার্থে। অনেকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আরো অনেকে এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। সবার বিশ্বাস, অর্পণা যে দক্ষতা অর্জন করেছে তাই হবে তার বেঁচে থাকার উপায় ও অবলম্বন। ধীরে ধীরে অর্পনা বিষয়টি উপলব্ধি করতে শুরু করে শোক কাটিয়ে উঠে আবার কাজে ফিরেছেন। দুই সন্তান ও কাজ নিয়েই তিনি স্বপ্ন দেখছেন সামনে এগিয়ে যাবার। সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার। অর্পণা বলেন, “যখন আবার গ্রামে গ্রামে কাজ শুরু করি তখন কেউ করুনা না করে আমার এই কাজে ফিরে আসাকে স্বাগত জানাচ্ছে, এটা কোন করুনা নয়, সত্যি কথা বলতে কি এই মানুষগুলোই আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছে। যখন দেখি তারা আমার কাছ থেকে সেবা নেয়, আমার উপর নির্ভর করে, পরামর্শ নেয় তখন বেঁচে থাকা সার্থক মনে হয়”।

আমি আশ্বস্ত হই যখন দেখি এলাকার মানুষ আমার উপর নির্ভর করে আর মন থেকে আমাকে পরামর্শ ও উপদেশ দেয়।

ফটো: তাপস পাল/কেয়ার বাংলাদেশ

নাসিমা

কর্মএলাকার প্রয়োজনীয় সুযোগগুলোকে সফল স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হয়ে উঠবার কাজে লাগাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় ঔষধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী স্থানীয় বাজার থেকে কিনে মা, শিশু ও কিশোরীদের কাছে বিক্রি করা শুরু করলেন।

নাসিমা (৩৭) ও তার স্বামী গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে ঢাকায় কাজ করতেন। হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও ঢাকার জীবনে স্বচ্ছলতার দেখা পাননি। অন্যদিকে ছেলে-মেয়ে বড় হচ্ছে, ঢাকায় থেকে তাদের লেখাপড়া শেখানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত প্রবল অনিশ্চয়তা স্বত্ত্বেও গ্রামে ফিরে যাবার পরিকল্পনা করেন। ২০০৯ সালে ঢাকার পাট চুকিয়ে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের হালাবাদী গ্রামে ফিরে আসেন।

গ্রামে ফিরে স্বামী গ্রাম্য পশু চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই কাজে আয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই। আরেকটু আয় বাড়াতে কিছুদিন পর স্বামী মাসিমপুর বাজারে একটি ছোট ঔষধের দোকান দেন, আর নাসিমা ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে কাজ শুরু করেন। দুজনের সামান্য আয় দিয়েই অভাবের ভেতরেই চলে তাদের সংসার। এভাবে কেটে যায় দীর্ঘ ছয় বছর।

কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ স্বাস্থ্যকর্মী কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণের সুযোগ আসে ২০১৪ সালে। প্রশিক্ষণ শেষে নাসিমা কাজ শুরু করেন। প্রথম দিকে প্রসবসেবা দিয়ে তার মোটামুটি রোজগার হতো। আরো স্বচ্ছলতার আশায় বাজারের ঔষধের দোকান থেকে মা ও শিশুদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ঔষধ ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী কিনে এনে বিক্রি করা শুরু করেন। বাড়তি কাজ করে বাড়তি রোজগার হতো প্রায় তিন-চার হাজার টাকা।

নিজের রোজগার আরো বাড়ানোর জন্য তিনি তার এলাকার বিভিন্ন সুযোগগুলো খুঁজতে থাকেন। মা, শিশু ও নারীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা উপকরণ বিক্রি বাড়াতে উদ্যোগী হন। এরই ধারবাহিকতায় তিনি সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানীর (এসএমসি) একজন কমিউনিটি সেলস এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই কোম্পানীর বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটারি উপকরণ নিজের কর্মএলাকায় বিক্রি শুরু করেন। কিশোরী ও মহিলাদের বাজারে গিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী সংগ্রহ করা কঠিন তাই তারা নাসিমার কাছ থেকে এসব পণ্য কেনা শুরু করেন। ২০১৫ সালে ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকর্মীর ১৮দিনের মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকায় কর্মরত স্বাস্থ্য সেবিকা ও কর্মীদের সাথে গড়ে তোলেন একটা বড় নেটওয়ার্ক।

বর্তমানে নাসিমা মাসে প্রায় সাত থেকে আট হাজার টাকা রোজগার করছেন। তার কর্ম এলাকায় প্রায় ২-৪টি স্কুলে কিশোরী মেয়েদের আয়রন বড়ি সহ স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী প্রদান

ফটো: তাপস পাল/কেয়ার বাংলাদেশ

করেন। পৌঁছে দিচ্ছেন ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ চাহিদা অনুযায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী। কর্মএলাকার বাইরেও ২-৩টি গ্রামে জরুরি প্রয়োজনে সেবা দিয়ে থাকেন। গর্ভবতী মায়েদের প্রসব পূর্ব ও পরবর্তী সেবা সহ, আয়রন ফলিক এসিড ও বিভিন্ন টেষ্ট করান। এসব কাজ করতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের সদস্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেন। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে

পুরোনো দিনের এনজিওতে কাজ করার সময় পরিচিত মানুষগুলো সহ এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবীদের নিজের প্রচারে কাজে লাগান। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ষ্টান্ডিং কমিটি, বাজার কমিটিগুলো এগিয়ে এসেছে নিজেদের পয়সায় তৈরী বিভিন্ন প্রচরনামূলক উপকরণ নিয়ে।

এখানেই থেমে থাকেনি নাসিমার স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা। আয় বাড়ানোর চেষ্টায় বর্তমানে নিজের বাড়িতে একটি ডেলিভারী রুম স্থাপন করেছেন। নিজের পয়সায় কিনেছেন লেবার টেবিল সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ এর সাথেই সেখানে প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রী দিয়ে সাজানো ছোট একটি ফার্মেসী। ভবিষ্যতে এই ডেলিভারী রুমকে আরো উন্নত ও আধুনিক মানের করে গড়ে তুলতে চান। চাহিদা অনুযায়ী দিনের একটা বিশেষ সময় তিনি তার বাড়ী সংলগ্ন এই সেবাকেন্দ্রে সেবা প্রদান করেন। এরপরই বেরিয়ে পড়েন গ্রামে, ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে। ১০ জন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী তার সার্ভিস প্রচার ও প্রসারে কাজ করছেন। তিনি মাসে গড়ে ৮০-৯০ জন মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবাপ্রদান করছেন।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলছেন। এরই মধ্যে তিনি তার ছেলেকে সিলেটে একটি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ভর্তি করিয়েছেন। মেয়ের বয়স ১১ বছর, পড়ালেখা করছে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এলাকার বিভিন্ন সুযোগ কাজে লাগিয়ে নাসিমা গার্মেন্টসের দুঃসহ কর্মপরিবেশ আর অনিশ্চয়তা মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে আয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই কাজই আমাদের জীবনের অনিশ্চিয়তা দূর করেছে অনেকাংশে।

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

জান্নাত

অল্প বয়সে বিয়ে আর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথে পথে বাঁধা পেরোনো।

১৮ বছর হবার আগেই তিনি আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েন, লোক লজ্জায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাননি।

বাল্যবিবাহের শিকার হন বাদাঘাট ইউনিয়নের কিশোরী জান্নাত (৩১)। শৈশব থেকেই স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে যায় বাবার চরম দারিদ্র্যের কারণে। তিন বোনের মধ্যে জান্নাত ছিল সবার বড়। পরিবারে তার বোনের সংখ্যা বেশী থাকায় এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার সাথে সাথে বাবা বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এসএসসি পরীক্ষার ফল বের হলে মেধাবী জান্নাত পরীক্ষায় পাশ করেন কিন্তু উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন অধরা থেকেই যায়।

স্বপ্নভঙ্গ আর স্বামীর দারিদ্র্যের ভেতর কিশোরী জান্নাত চরম অসহায় বোধ করতে থাকেন। স্বামী একজন দিনমজুর, যেদিন কাজ থাকে সেদিন বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরেন, যেদিন কাজ থাকে না সেদিন ঘরে খাবার মত কিছু থাকে না। সংসারে এই চরম প্রতিকূলতার ভেতর জান্নাত পড়াশুনা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাড়তি কিছু আয়ের আশায় শিক্ষকতার কাজ নেন স্থানীয় ব্র্যাক স্কুলে। কিন্তু বয়স ১৮ বছর হবার আগেই তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এই কিশোরী বয়সে গর্ভবতী অবস্থায় চলাফেরার লোকলজ্জা আর সন্তানের নিরাপত্তার চিন্তায় শেষ পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষাটাও দিতে পারেননি।

তখনই কেয়ার জিএসকে -এর প্রাইভেট সিএসবিএ-র প্রশিক্ষণ এর সার্কুলার আসে। প্রথমবার প্রশিক্ষণের সুযোগ আসে কিন্তু গর্ভবতী অবস্থায় প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরপরও দীর্ঘসময় জান্নাতকে অপেক্ষা করতে হয়। পরবর্তী ব্যাচে যখন আবার প্রশিক্ষণের সুযোগ পান তখনও তার শিশু কোলের বাচ্চা। তৃতীয়বার যখন এই প্রশিক্ষণের সময় এগিয়ে আসতে থাকে তখন তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কোনক্রমেই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। কিন্তু প্রশিক্ষণে যাওয়ার সিদ্ধান্তে স্বামী আপত্তি জানায়। যেভাবেই হোক স্বামীকে রাজি করানোই হয়ে দাঁড়ায় তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অন্যদিকে কেয়ার জিএসকের কর্মীরা এসএসসি পাশ করা এবং বিবাহিত স্থানীয় মহিলাদের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে। জান্নাতের সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য তাড়া দিতে থাকেন। কিন্তু স্বামীকে রাজি করানোর কাজটাও ততটা সহজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সহায়তায় তার স্বামীকে বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হন। ঠিক হলো, ছয়মাসের প্রশিক্ষণে পরিবার ও বাচ্চা দেখাশোনার দায়িত্ব নিবেন স্বামী ও শ্বাশুড়ি।

কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ পরিচালিত ছয় মাসের প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করে গ্রামে ফিরে এসে সেবাপ্রদান শুরু করেন। জান্নাত

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

এখন স্বাবলম্বী। প্রসূতি মায়েদের এবং শিশুদের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সী মানুষকে প্রয়োজনীয় সেবা, ঔষধ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সহ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি দিচ্ছেন তাহিরপুরের এই দুর্গম এলাকায়। প্রতি মাসে আয় করছেন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। যখন তার কোন আয় ছিল না তখন তার পরিবারে কোন অবস্থানই ছিল না, সংসারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার বা দেয়ার ক্ষমতা ছিল না। আর বর্তমানে পরিবারে ও সমাজে তার সম্মান এবং গুরুত্ব দুটোই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিজের আয়ে গত বছর দুটি গরু আর একটি নৌকা কিনেছেন জান্নাত। এখন আর স্বামী দিনমজুরি করেন না। এখন তিনি ভাড়ায় নৌকা চালান। দু'জনের আয়ে দূর হয়েছে সংসারের দারিদ্র্য। জান্নাত নিজের আয়ের টাকায় ভাঙ্গা বাড়িটি নতুন করে টিন দিয়ে সংস্কার করেছেন। এখন সন্তানের পড়ালেখার খরচ জান্নাতই বহন করেন।

পেশাগত দায়িত্বপালনে স্বামী তাকে সার্বিক সহযোগিতা করে চলেছেন। জান্নাত যখন বাড়ির বাইরে সেবা দিতে চলে যান তখন তার স্বামী বাচ্চাকে দেখাশুনা করেন, রান্নার কাজ করেন পাশাপাশি শ্বাশুড়িতো রয়েছেন। বাদাঘাট বাজার থেকে ঔষধ কিনে আনা থেকে শুরু করে রাতের বেলা ডেলিভারীর কাজে নিয়ে যাওয়া অথবা মটর সাইকেল, নৌকা ঠিক করে দেয়া পর্যন্ত সব সহযোগিতা স্বামীর কাছ থেকে পান।

কাজ নিয়ে স্বামী ও শ্বাশুড়ি কারো কোন অভিযোগ নেই, সবাই বাড়ীর কাজ আর বাচ্চা দেখা শোনার কাজে সহযোগিতা করেন।

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

শংকরী

নতুন করে ফিরে পাওয়া আত্ম বিশ্বাস আর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শংকরীকে দিচ্ছে বাড়তি সুবিধা।

অল্প বয়সী ও অবিবাহিত মেয়েকে সমাজ এই কাজে গ্রহন করতে পারছিল না।

প্রাইভেট সিএসবিএ-দের মধ্যে শংকরীর (২৮) সংগ্রামটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। প্রায় সকল দক্ষ প্রসবকালীন স্বাস্থ্যকর্মী বিবাহিত হলেও শংকরী ছিলেন অবিবাহিত। কমবয়সী ও অবিবাহিত একটি মেয়ের পক্ষে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এধরনের কাজ করাকে কেউই ভালো চোখে দেখে না। রাতবিরেতে চলাফেরা করতে ঝুঁকিও বেশী। আবার গর্ভবতী নারীরাও অবিবাহিত একটি মেয়ের কাছ থেকে সেবা বা পরামর্শ নিতে চায় না।

বড় ভাইবোনেরা সবাই বিয়ের পর আলাদা সংসার শুরু করেছে। প্রত্যেকেই নিজেদের সংসার সামলাতে ব্যস্ত। তাই বৃদ্ধ মা-বাবার ভরণ পোষণের দায়িত্ব এসে পড়ে কনিষ্ঠ মেয়ে শংকরীর উপর। তার স্বপ্ন ছিল মা-বাবার সেবা-যত্ন নেয়ার পাশাপাশি নিজের পেশায় উন্নতি করা ও স্বাবলম্বী হওয়া। তাই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও সাহস করে ২০১৩ সালে কেয়ার জিএসকে প্রকল্পের আওতায় প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ প্রসবকালীন স্বাস্থ্য সেবাকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। অন্যদিকে কর্মএলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। কাজ শুরুর প্রথম দিকে আয়ের চেয়ে যাতায়াত খরচ হতো বেশি। মাসিক প্রতিবেদনে পারফরমেন্স একদম তলানীতে গিয়ে পড়েছিল। সব কিছু অর্থহীন মনে হচ্ছিল, শংকরী কাজে বের হওয়া কমিয়ে দিলেন। অন্য কোন কাজ শুরু করা যায় কিনা ভাবতে লাগলেন।

তবে কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ প্রকল্প শুধু প্রশিক্ষণ দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করেনি। প্রকল্প প্রতিনিধিরা সকল প্রাইভেট সিএসবিএ-দের সার্বক্ষণিক খোঁজ রেখেছেন এবং শংকরীর মত হতাশ হয়ে যাওয়া কর্মীদের নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। এই ভাবনা থেকে দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি আছে এমন প্রাইভেট সিএসবিএ-দের নিয়ে ক্লিনিক্যাল এটাচমেন্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি সামাজিক ব্যবসা সহ জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন দেয়া হয়।

জেলা সদর হাসপাতালে অন্যান্যদের সাথে দশ দিনের ক্লিনিক্যাল এটাচমেন্ট প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করার পর শংকরী আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। সামাজিক চাপ উপেক্ষা করে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে দিলেন। কেয়ার কর্মীদের সহায়তায় উঠান বৈঠকে নারী এবং গর্ভবতী পরিবারের সাথে আলোচনায় বসে দক্ষ স্বাস্থ্য সেবার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রসব পরিকল্পনা বিষয়ক অলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি গর্ভবতী মায়েদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন। ফলশ্রুতিতে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে, যারা তাকে ফিরিয়ে দিতেন এবার তারাই তাকে ডাকতে শুরু করলো। ২০১৬ সালে যেখানে

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

মাসে মাত্র একটি ডেলিভারী করাতেন সেখানে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে এখন তিনি মাসে গড়ে আটটি করে ডেলিভারী করান। সাথে দিয়ে থাকেন অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণ।

শংকরী জানান, 'যে সমাজ আমাকে গ্রহণ করতো না, তারাই এখন আমাকে সেবা ও পরামর্শের জন্য ডাকে, সম্মান করে। একজন স্বাবলম্বী নারী হিসেবে পরিবার ও সমাজে আমার পরিচিতি পেয়েছি, বেড়েছে মর্যাদা; যেটা সকল নারীদের জন্য জরুরি।'

সংগঠক হিসেবেও দারুণ দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন শংকরী। কাজে উৎসাহ দেয়ার জন্য তার সহযোগী কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে ঘোষণা করেছেন বিভিন্ন পুরষ্কার। একজন স্বেচ্ছাসেবীকে নিজের খরচে কিনে দিয়েছেন মোবাইল ফোন। যা প্রাইভেট সিএসবিএ-দের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা ও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। দ্রুত সেবাগ্রহীতাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি মটর সাইকেল কিনেছেন যা তিনি হেমন্ত কালে অর্থাৎ শুকনো মৌসুমে যখন হাওড় শুকিয়ে যাবে তখন ব্যবহার করবেন। একটা হিসেব করে দেখেছেন এতে তার যাতায়াত খরচে অনেকটা সাশ্রয় হবে। মটর সাইকেল কিনতে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা তিনি নিজের উর্পাজন থেকে করেছেন। বাকি আট হাজার টাকা নিয়েছেন উপজেলার প্রাইভেট সিএসবিএদের কল্যাণে তৈরি করা তাদের সংগঠনের নিজস্ব তহবিল থেকে। এখন কারো সাহায্য ছাড়াই শংকরী যে কোন সময়ে জরুরি ডাকে রওনা করতে পারেন সেবাগ্রহীতার বাড়িতে। অন্যান্য প্রাইভেট সিএসবিএদের জন্যে এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেকে এখন এই ধরনের মটর সাইকেল কেনার পরিকল্পনা করছে।

শংকরী এখন জনগণের সেবা করার পাশাপাশি নিজের মা-বাবার দেখাশোনা ও সেবা করতে পারছেন। শংকরীর পরিবারে এখন অভাব শব্দটি নেই। এলাকার মানুষের কাছে শংকরী আদর্শ ও ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

সেবাগ্রহীতার কাছে দ্রুত পৌঁছার জন্যে তিনি একটি মটর সাইকেল কিনেছেন।

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

রুকসানা

এই কঠিন পথচলা ডায়রীতে লিখে রাখছেন।

রুকসানা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষন আর বঞ্চিত হওয়ার কথা গুলো একটি ডায়রিতে লিখছেন ।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত অনেক নারীর মতই রুকসানাও (৩১) শিকার হয়েছিলেন পারিবারিক নির্যাতনের। ২০০৯ সালে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই নির্যাতন চালাতো স্বামী। প্রথম সন্তান জন্মের পর যৌতুকের দাবিতে সেই নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। টাকা দিতে না পারায় রুকসানাকে তালাক দিয়ে স্বামী কুমিল্লা গিয়ে আরেকটি বিয়ে করে। এরপর সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেন রুকসানা।

এই অন্যায়ের বিচার চাইতে গিয়ে আরো অপমান ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। রুকসানার একটি ডায়রী আছে, সেখানে তিনি লিখেছেন কিভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তাকে প্রতিনিয়ত হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে, কিভাবে আইন ও গ্রাম্য সালিশের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা ঘুষ দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে তার সাথে অবিচার করেছে।

বিচার না পেয়ে রুকসানা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু বাচ্চাকে মানুষ করার তাগিদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। এসব দুর্ঘটনার পর বাবার বাড়িতে বোঝা না হয়ে বরং কাজ খুঁজতে থাকেন। দুটি এনজিওতে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ ছাড়াও বেশ কিছু অস্থায়ী কাজ করেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে রুকসানা বলেন, 'অনেক কাজই করেছি, কোনো কিছু স্থায়ী ছিল না। কিন্তু প্রাইভেট সিএসবিএ হওয়ার পর স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হিসেবে একটা নতুন জীবন শুরু করি। কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ এর প্রশিক্ষণ নিয়ে আজ আমি স্বাবলম্বী।'

রুকসানা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ২০১৬ সালের জানুয়ারীতে। ২০১৭ সালের বন্যায় অচল হয়ে পড়ে সুনামগঞ্জের হাওড়াঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা। এমন দুর্যোগে গর্ভবতী নারীদের দূরবস্থা অকল্পনীয়। এই দুর্যোগেও কোমর সমান পানি ভেঙে বাচ্চা প্রসব করাতে গিয়েছেন প্রাইভেট সিএসবিএ রুকসানা। পূর্বের এনজিওতে কাজ করার পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে ছুটে গেছেন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে। পৌঁছে দিয়েছেন জন্মনিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সামগ্রী। তার সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তার কর্মএলাকা গৌরারং ইউনিয়নের এক নারী বলেন, 'আমাদের অঞ্চলে মহিলাদের এসব জিনিস নিয়ে কেউ আগে আমাদের কাছে আসেনি। এখন রুকসানা আপা বাড়ি বাড়ি এসে আমাদেরকে এগুলো দিয়ে যান। যেকোন সময় ডাকলে তিনি ছুটে আসেন।'

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

নিজের প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যায়ের বিচার না পেলেও অনেকের কাছ থেকেই সহযোগিতাও পেয়েছেন রুকসানা। প্রাইভেট সিএসবিএ হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তাকে ভিজিটিং কার্ড বানিয়ে দিয়েছে, নিজের ভাই তার মোবাইল মেরামতের দোকান থেকে প্রচার চালাচ্ছে। ওষুধ কোম্পানির লোক বাড়িতে এসে ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে, এরই মধ্যে এসএমসি সহ বিভিন্ন মান সম্মত ফার্মেসীর সাথে তৈরী করেছেন একটি লিংকেজ। ফলে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঔষধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সেবাগ্রহীতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি পৌঁছে দিচ্ছেন। লালপুর বাজারের কাছেই বাড়ীর সাথেই তৈরী করেছেন একটি সেবাকেন্দ্র আর ফার্মেসী সেখানে সুনামগঞ্জ থেকে ওষুধ এনে ছোট বোন সাজিয়ে দেয় ফার্মেসীতে। সারাদিন কমিউনিটিতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সেবা দিয়ে বিকেলের দিকে এই সেবা কেন্দ্রে বসেন। অনেক সেবাগ্রহীতাই সেবা আর ঔষধ নিতে আসেন। রুকসানা। ঔষধ বিক্রির সাথে সাথে বিভিন্ন টেষ্ট করেন যেমন হিমোগ্লোবিন, ইউরিন, ডায়বেটিস ইত্যাদি। সবমিলে তার মাসিক আয় এখন গড়ে প্রায় দশ হাজার টাকা। কয়েকজন পরিশ্রমী স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী তার সব কাজে নিয়মিত সহায়তা করেন। মাসে এখন গড়ে ৫–৭ টি বাচ্চা প্রসব করান।

নিজের উপার্জনের টাকায় বন্ধক নিয়েছেন একখন্ড জমি। রুকসানার এখন একটাই স্বপ্ন: একমাত্র ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করে বিসিএস কর্মকর্তা বানাবেন। একসময় যেসব লোকেরা তাকে বাঁকা চোখে দেখতো, সাবলম্বী হওয়াতে সেইসব লোকের কাছে এখন মর্যাদা বেড়েছে তার। তবে শুধু সেবামূল্য নিয়ে নয়, বিনামূল্যেও সেবা দিয়ে থাকেন তিনি। রুকসানা বলেন, 'যারা আমার কাছ থেকে সেবা নিয়ে পয়সা দিতে পারে না, তারা যে সম্মানটা করে তা পয়সার থেকে অনেক বড়।' এই সম্মান আর ভালোবাসা নিয়েই বাকি জীবন মানুষের সেবা করে যেতে চান রুকসানা। পারিবারিক এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সাথে লড়াই করে রুকসানা আজ একজন সফল নারী স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা।

যারা সেবা মূল্য দিতে পারে না তারা যে সম্মান আর ভালোবাসা দেয় তার মূল্য আমার কাছে অনেক বড়।

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

মার্জিয়া

রোজগার বাড়াতে সেবার সম্প্রসারণ ও তার সর্বোচ্চ ব্যবহার।

জীবনের একটা কঠিন সময়ে তিনি উপলব্ধি করলেন যে একটি বাস্তব সম্মত পেশাই পারে তার পারিবারিক ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে।

বাল্যবিবাহ যে একজন নারীর জীবনে কত বড় দুর্যোগ বয়ে আনতে পারে তার প্রমান পাওয়া যায় সুনামগঞ্জের মার্জিয়া বেগমের (৩১) গল্পে। বাল্যবিবাহের মত পশ্চাৎপদ সামাজিক প্রথা শিক্ষাবঞ্চিত দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলগুলোতে নারীর উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা । অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায় বলে অনেক নারীই মেধা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমাজে কোন অবদান রাখতে পারেন না।

জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের মেয়ে মার্জিয়া। ২০০৫ সালে বিয়ে হয়ে যায় কিশোরী মার্জিয়ার। বিয়ের মাত্র দুই বছরের মাথায় মারা যান স্বামী। কোলে তখন তার দুই বছরের শিশু সন্তান। শ্বশুর বাড়িতেও বেশিদিন ঠাঁই হয়নি। দিশেহারা অবস্থায় কোলের সন্তান নিয়ে ফিরে আসেন বাবার বাড়িতে। এমন চরম সঙ্কটমুহূর্তেই সে উপলব্ধি করে, একমাত্র উপার্জনই পারে সমাজ এবং পরিবারে নারীর সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করতে।

ঘুরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় মার্জিয়া। তাই পূর্নোদ্যমে আবার পড়ালেখা শুরু করেন। ২০১৩ সালে এইচএসসি পাশ করেন। পড়ালেখার পাশাপাশি এই সময়ে বিভিন্ন এনজিওতে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করেন। এই সময়ে সুনামগঞ্জে শুরু হয় বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ে সুপারিশে কেয়ার জিএসকে-র প্রাইভেট সিএসবিএ বা দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরীর উদ্যোগ প্রকল্প। অনেক আগ্রহ নিয়ে প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন মার্জিয়া।

প্রথম থেকেই কাজে খুব ভালো ছিলেন তিনি। কাজটিকে তিনি মন থেকে গ্রহণ করেন, মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পরার্মশ ও সেবা দিতেন, নিজের প্রচার করতেন, কিন্তু তার আয় পর্যাপ্ত ছিলো না। কর্মএলাকার পাশেই আবস্থিত নবীগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রেই বেশিরভাগ গর্ভবতী মহিলারা বাচ্চা প্রসব করাতেন। অন্যান্য সেবা বিক্রি করলেও মাসে দু-একটির বেশি প্রসব করাতে পারতেন না তিনি। এ অবস্থায় বিকল্প কাজ খুঁজতে শুরু করেন।

প্রশিক্ষণ শেষ হবার পরও কেয়ার বাংলাদেশ প্রাইভেট সিএসবিএদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখে। তারই অংশ হিসেবে এসএমসি কোম্পানির সহযোগিতায় কেয়ার বাংলাদেশের উদ্যোগে জগন্নাথপুর উপজেলার প্রাইভেট সিএসবিএদেরকে নিয়ে সামাজিক ব্যবসা ও কমিউনিটি বিক্রয়

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

প্রতিনিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়। দুই দিনব্যাপি এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরই স্বাস্থ্যসেবার এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পান মার্জিয়া। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি পণ্যের বড় বাজার উন্মোচিত হয় তার সামনে। নিজের জমানো বিশ হাজার টাকা দিয়ে এই সময়ে এসএমসি কোম্পানির কাছ থেকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসামগ্রী কিনে বিক্রি করতে শুরু করেন তিনি। প্রথম মাসেই সব সামগ্রী বিক্রি হয়ে গেলে আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হন তিনি। এরপর থেকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিক্রয়কে প্রাধান্য দিয়ে চালিয়ে গেছেন স্বাস্থ্য সেবা। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে লিংক করে পরিবার পরিকল্পনার স্বল্প মেয়াদী পদ্ধতির সামগ্রী সমূহ নিয়মিত সংগ্রহ করে পৌছে দিচ্ছেন সেবাগ্রহীতাদের নিকট। এর ফলে বিস্তৃত হচ্ছে তার সেবার পরিধি ও কমিউনিটিতে গ্রহনযোগ্যতা।

নিজের কাজের পাশাপাশি সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সাথেও সবসময় সুসম্পর্ক ও ভালো একটি সমন্বয় বজায় রেখেছেন মার্জিয়া। তাদের সহযোগীতায় সে এখন পার্শ্ববর্তী বাগময়না ও মেঘারকান্দি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতি সপ্তাহে গর্ভবতী মায়েদের প্রসব পূর্ব সেবা প্রদান সহ প্রসব করানোর কাজ শুরু করেছেন। কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যদের প্রচার ও উৎসাহে সেবাগ্রহীতারা সাধ্যমত সেবামূল্য পরিশোধ করছেন। এভাবে তার কাজের পারফরমেন্স ও রোজগারেও একটা পরিবর্তন এসেছে। কাজের প্রতি নিষ্ঠা, নিরলস পরিশ্রম ও অগ্রগতি দেখে জগন্নাথপুর উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তাকে পুরস্কৃত করেছেন । মার্জিয়া বেগম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'মানুষের সাথে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগের দক্ষতা আমাকে এই সফলতা দিয়েছে।'

মার্জিয়া বেগম এখন নিজের আয় থেকে বাবার সংসারের পুরো খরচ চালান, সন্তানের লেখাপড়ার খরচের পাশাপশি সঞ্চয়ও করছেন তার ভবিষ্যতের জন্য। তার স্বপ্ন নিজের সন্তানটিকে এমনভাবে মানুষ করা যাতে সেও বড় হয়ে মানুষের সেবা করতে পারে।

একজন স্বাবলম্বী নারী হিসেবে তিনি তার বাবার পরিবারের সব খরচ চালান।

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

সেলিনা

বিপদকালীন মুহূর্তে গর্ভবতী মায়েদের সাথে থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ আর সাথে করে সেবাকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচাচ্ছে।

কাজের প্রতি এই ধরনের ত্যাগ আর নিষ্ঠা তাকে দিয়েছে একটি ভিন্ন মাত্রার পরিচয়।

২০১৭ সালের আগষ্ট মাসের ঘটনা। মনোহরপুর গ্রামের ২২ বছর বয়সী গৃহবধু হাবিবা প্রসবের জটিলতায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। কেয়ার বাংলাদেশ প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা সেলিনা (২৬) তখন পার্টোগ্রাফ করে দেখে, স্বাভাবিক প্রসব হবে না বলে রিপোর্ট দেন। রোগী হাবিবাকে সাথে নিয়ে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে যান, রাত তিনটার সময় নিরাপদে ডেলিভারী সম্পন্ন হয়। সেদিনের কথা বলতে গিয়ে হাবিবার স্বামী হাসিমুখে জানান, ‘সেলিনা আপা যদি সময়মত সুনামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে না যেতেন তাহলে হয়ত আমার স্ত্রী-সন্তান কাউকেই বাচাঁতে পারতাম না।’

একই রকম ঘটনা ফতেপুর গ্রামের লাভলির ক্ষেত্রেও। তাকে নিয়ে সেলিনা যখন সুনামগঞ্জ মাতৃমঙ্গল যান তখন রাত চারটা। সেখানেই সিজারে বাচ্চা হয় লাভলির। এভাবেই প্রসবকালীন মায়েদের সংকটপূর্ণ সময়ে পরার্মশ দিয়ে সাথে করে নিয়ে যায় হাসপাতাল, ক্লিনিকে নিয়ে সেবা দিয়ে রীতিমত নিজের স্বতন্ত্র এক পরিচয় তৈরী করেছেন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাপাড়া ইউনিয়নের প্রাইভেট সিএসবিএ সেলিনা। সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্মানীতে সেলিনা স্বাবলম্বী। এসেছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান।

সেলিনার কাজ শুরুর সময়ের পরিবেশ তার অনুকূলে ছিল না। বিপণন কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে সেলিনার বিয়ে হয় ২০০৯ সালে। দুটি সন্তান জন্মের পর সংসারের খরচ মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে স্বামীর বিক্রয় প্রতিনিধির কাজ চলে যায়,কোন কাজই বেশীদিন স্থায়ীভাবে করতে পারে না। সেলিনা বুঝতে পারেন সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে হলে তাকেও আয় করতে হবে। এই সময়ে তিনি কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ্ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ পরিচালিত দক্ষ প্রসবকালীন স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণের খবর পান। গ্রাম্য ধাত্রীদের অদক্ষতা ও অসচেতনতার কারণে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল প্রকট। এই উদ্যোগটির উদ্দেশ্যই হল মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, প্রসবকালীন স্বাস্থ্যসেবার মান বাড়ানো এবং প্রয়োজনীয় সেবার প্রসার।

সেলিনা ২০১৬ সালে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে কাজ শুরু করতে গেলে বাঁধা হয়ে দাড়ায় গ্রাম্য ধাত্রীরা, নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে বলে তাঁরা চাইত না সেলিনা ওনাদের এলাকায় কাজ করুক। আবার অনেকেই সেলিনাকে সরকারি সেবাপ্রদানকারী ভেবে সেবামূল্য দিতে চাইত না। এভাবে তিনি চালিয়ে যেতে পারবেন কিনা

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

সেটা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন। তখনই ভিন্নপন্থা অবলম্বন করতে শুরু করেন সেলিনা। তিনি সারারাত হাসপাতালে থাকেন রোগীদের সাথে, যা কোন সরকারি চাকুরিজীবিরা করেন না। হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়া ও তাদের সাথে থাকার কারণে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের সাথে একটি দারুণ সুসর্ম্পক তৈরি করেন সেলিনা। সেই সাথে তিনি ধীরে ধীরে এলাকার ধাত্রীদের সাথেও গড়ে তুললেন সুসম্পর্ক। এখন তিনি এলাকার প্রসবজনিত সেবা সম্পর্কিত জনপ্রিয় পরামর্শক। এসএমসি কোম্পানির সাথেও সেলিনা একটি ভালো সর্ম্পক তৈরী করেছেন, কোম্পানি থেকে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে গ্রহীতাদের কাছে সুলভ মূল্যে বিক্রি করেও আয় করেন।

নিজের কাজে সফলতা পেতে স্বামীর কাছ থেকে সবধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন সেলিনা। বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা দিয়ে স্বামী নিজেই কাজের ফাঁকে দায়িত্ব নেন সেলিনার কাজের মার্কেটিং আর প্রচারের। সেলিনার ব্যস্ত সময়ে তার স্বামী পরিবারের রান্না থেকে শুরু করে বাচ্চাদের দেখাশোনা পর্যন্ত করেন। স্থানীয় বাজার থেকে ঔষধ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী এনে দেন এবং সেগুলো মাঠ পর্যায়ে সেলিনার কাছে পৌঁছে দেন। এছাড়া রাত্রিকালীন সেবা প্রদানে গেলে স্বামীই সাথে নিয়ে যান সেলিনাকে। দেখতে দেখতে সেলিনার বাজার প্রসারিত হতে থাকে, সাথে সাথে রোজগারও বাড়ে, এখন দুই সন্তানের আব্দার পূরন করতে পারেন, লেখাপড়ার খরচ সহ নতুন কাপড় কিনে দেন। আবার খুশি হয়ে সেলিনা স্বামীকে কিনে দিয়েছেন দামী মোবাইল ফোন। স্ত্রীর কাজে গর্বিত সেলিনার স্বামী জানান, "স্ত্রীর উপার্জনের ফলেই তাদের সংসারে সুখ ও স্বচ্ছলতা এসেছে"।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন শুধুই একজন দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, মান সম্মত সেবা দিয়ে সুনামগঞ্জের এই দূর্গম এলাকায় সেবা বঞ্চিত মানুষের পাশে থাকতে চান।

স্বচ্ছলতা এসেছে পরিবারে, স্বামী সংসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে পারস্পারিক সম্মান আর সহযোগীতার।

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

হেলেনা

কঠিন সময় অতিক্রম করে প্রাইভেট দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী হেলেনা এখন খুবই জনপ্রিয় নাম।

হিসাবের গরমিল থাকার কারণে চাকুরি হারান, এঘটনায় তার নামে একটি মামলা হয়।

ধর্মপাশা উপজেলার প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলের মেধাবী ছাত্রী হেলেনা (২৭)। দারিদ্র্যের কারণে বেশিদূর পড়াশুনা করা সম্ভব হয়নি। এসএসসি পাশ করার পর কার্তিকপুরের আবুল কাইয়ুম এর সাথে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। নিজের ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও বিয়ের পর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেননি। সংসারের প্রয়োজনে বাড়তি আয়ের আশায় ব্র্যাকের মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামে মহেষখলা বাজারে দুই বছর চাকুরি করেন। হিসেবের গরমিল থাকার কারণে চাকুরি হারান, এ ঘটনায় তার নামে একটি মামলা হয়। এদিকে স্বামীর সামান্য বেতনের চাকুরি। স্বামীর চাকুরির আয়ে টানাটানির সংসার। এরই মধ্যে হেলেনা সন্তানের মা হন। ফলে তাদের সংসারের খরচ আরো বেড়ে যায়। অভাবের তাড়নায় সংসারে ঝগড়া কলহ লেগেই থাকতো। সংসার ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন সংকটময় সময়ে কিছুটা আশা জাগিয়ে তোলে কেয়ার জিএসকে-র প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ।

২০১৩ সালে কেয়ার জিএসকে-এর উদ্যোগে প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচিত হন। নেত্রকোনায় সফলভাবে ৬ মাস ব্যাপী সিএসবিএ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে হেলেনা আক্তার শুরু করেন এক নতুন জীবন। অ্যাপ্রোন আর কমলা রঙের শাড়ি পরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের এবং নবজাতক শিশুদের সেবা দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন দক্ষ স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হিসেবে। ব্র্যাকে কাজ করার সময়ের সেই মামলা পরিচালনা করতে এ পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়েছে। নিজের উপার্জন থেকে সব টাকার সংস্থান করেছেন। সংসার ভাঙেনি বরং স্বামী-সন্তানসহ পারিবারিক কলহমুক্ত সুন্দর জীবন যাপন করছেন।

তবে শুরুর দিকে তার রোজগার ছিল নিতান্তই নগন্য। খুশি হয়ে যে যা সেবামূল্য দিত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে দক্ষতা আর ধীরে ধীরে অর্জন করেছেন মানুষের আস্থা; তাই উপার্জনও বেড়েছে। মান সম্মত সেবা প্রদানের জন্য মানুষের কাছে আর সেবা মূল্য চাইতে হয় না, তারা আপনা আপনি সেবা মূল্য পরিশোধ করে। এলাকাবাসীর কাছে হাসি মুখে সেবাপ্রদানের জন্য এখন হেলেনা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং নির্ভরযোগ্য একটি নাম।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হেলেনা জানান, 'নিজের চেষ্টা আর কেয়ার জিএসকে- র সহযোগিতা না পেলে জানি না কিভাবে জীবন কাটাতে হতো, সংসারও হয়তো টিকিয়ে

ফটো: ইমতিয়াজ পাভেল/কেয়ার বাংলাদেশ

রাখা সম্ভব হতো না। আজ আমি স্বাবলম্বী আর একজন সুখী মানুষ। সেবা ও সুবিধা বঞ্চিত মা ও শিশুদের সেবা দিতে পেরে নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করি।'

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাত্রিকালীন ডেলিভারীর ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য পরিষদ থেকে গ্রাম পুলিশ বা কমিটির সদস্যরা তাকে নিরাপত্তা দেবে। সোনারতরী কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের সদস্যরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন প্রতি মাসে হেলেনার আয় প্রায় বিশ হাজার টাকা। নিজের নামে একটু জমি কিনে বাড়ি করেছেন। নিজের টাকায় স্বামীকে মটর সাইকেল কিনে দিয়েছেন, দূর দূরান্ত থেকে ডেলিভারীর সংবাদ আসলে স্বামীর মটর সাইকেলে চড়ে দ্রুত পৌঁছে যান রোগীর বাড়িতে।

উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারেননি ঠিকই, তবে নিরলস পরিশ্রমে সে আজ সম্পূর্ণ অর্থেই সফল একজন নারী স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা। সম্প্রতি আইসিডিডিআরবি-পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী হেলেনা তার কর্ম এলাকার ইউনিয়নের প্রায় ৯,০০০ জনগোষ্ঠীকে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করছেন। এলাকায় ৭৫ ভাগ গর্ভবতী মাকে সরকারী রেজিষ্ট্রেশনের আওতায় নিয়ে এসেছেন। ডেলিভারী সম্পন্ন করছেন প্রায় ৫০% গর্ভবতী নারীর।

সফল এই নারী স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা একদিকে এলাকায় মান সম্মত সেবা প্রদানের জন্য যেমন প্রশংসিত হয়েছেন ঠিক তেমনি তার সংগ্রামী প্রতিষ্ঠা অন্যান্য নারীর জন্যে তৈরী করেছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এরই মধ্যে তার ইউনিয়নে সফল নারী হিসেবে স্থানীয় নারী ও শিশু বিষয়ক বিভাগ থেকে জয়িতা পুরস্কার পেয়েছেন। আবার জাতীয় পর্যায়ে সেবা বঞ্চিত মা ও শিশুদের দক্ষ সেবা প্রদানের হার বাড়ানোর জন্যে একজন সফল সিএসবিএ হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ২০১৮ সালে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়েছেন।

কঠোর পরিশ্রম আর হাসিমুখে সেবা দেয়ার জন্যই হেলেনা খুবই জনপ্রিয়।

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

জোছনা

সেবা গ্রহীতাদের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ আত্ম প্রত্যয়ী করে তুলেছে।

তার পেছনের গল্পটা আরো ধূসর, আরো দারিদ্র পীড়িত এক জীবনের। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় বাবার মৃত্যুজোছনাকে ঠেলে দেয় অনিশ্চয়তার ভেতর।

স্বামী সামান্য একজন রং মিস্ত্রি। কাজের প্রয়োজনে সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় দিনমজুরির কাজ করেন। শীতের সময় ছাড়া বেশিরভাগ সময়ে রং মিস্ত্রিদের কাজ থাকে না। বর্ষাকালে কাজ না আসায় কোনো আয় থাকে না। এমন দরিদ্র পরিবারের অসহায় গৃহবধূ জোছনা বেগম (৩১)। তার পেছনের গল্পটা আরো ধূসর, আরো দারিদ্র্যপীড়িত এক জীবনের। ক্লাশ সিক্সে পড়ার সময় বাবার মৃত্যু জোছনাকে ঠেলে দেয় অনিশ্চয়তার ভেতর। ২০০৮ সালে এসএসসি পাশ করার পরে গোবিন্দগঞ্জ কলেজে এইচএসসি তে ভর্তি হন, পাশাপাশি ফ্রেশ নামে একটি স্থানীয় এনজিওর কর্মী হিসেবে কাজ করা শুরু করেন। মাসে ৪,০০০ টাকা বেতন থেকে মাকে সংসার চালাতে সাহায্য করতেন আর নিজের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে নিতেন। কিন্তু পড়ালেখা শেষ করার আগেই বিয়ে হয় ২০১০ সালে।

বিয়ের পর সে পুরোপুরি স্বামীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পর পর দুটি বাচ্চার মা হন। এদিকে ২০১৬ সালে কেয়ার জিএসকে সিএইচ ডাব্লিউ পরিচালিত প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষনের কথা শুনে আশান্বিত হন- মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর পাশাপাশি নিজের স্বাবলম্বী হবার সম্ভাবনা।

২৩ বছর বয়সী জোছনা বেগম এই প্রশিক্ষনের ৪র্থ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দ্রুত প্রশিক্ষণ শেষ করেন কিন্তু এর ভিতরে তিনি আবারও গর্ভবতী হয়ে পড়েন। হতাশা কাটিয়ে গর্ভকালীন অবস্থায়ই তিনি দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ শুরুর প্রস্তুতি চালিয়ে যান। তৃতীয় সন্তান জন্মের পরপরই জোছনা প্রাইভেট সিএসবিএ হিসেবে কাজ শুরু করেন।

বর্তমানে ছাতক উপজেলায় তিনি একমাত্র প্রাইভেট সিএসবিএ যার কর্মএলাকার বেশিরভাগ গর্ভবতী মায়েরা সরকারী রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এসেছে। ১০ জন স্বাস্থ্য সেচ্ছাসেবীর মধ্যে সবার সাথে গড়ে তুলেছেন চমৎকার পেশাদারী সম্পর্ক। জোছনার উপস্থিতি ছাড়া কোন টিবিএ বা গ্রাম্য ধাত্রী ডেলিভারীর চেষ্টা করেন না, আর খবর পাওয়ার সাথে সাথেই জোছনা ঠিকই হাজির হয়ে যান রোগীর বাড়িতে। নিজের বাজার প্রসারে জোছনা সাহায্য নেন স্থানীয় মাঠ পর্যায়ের পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সহায়তা, এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ তো তার সেবার প্রচারে বিভিন্ন সহযোগীতা করে থাকে। স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকে মাসের নিদ্দিষ্ট সময় বসেন ও মা সমাবেশে প্রসব পূর্ব সেবা প্রদান সহ প্রতি মাসেই এখানে দুই একটি করে ডেলিভারী করান, যা তার গ্রহনযোগ্যতা তৈরীতে রেখেছে একটি বিশেষ অবদান।

ফটো: তাপস পাল/কেয়ার বাংলাদেশ

পেশাগত দক্ষতা এবং দায়িত্ববোধের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্গম এলাকায় যেতে হলেও ঠিক সময়ে পৌঁছে যান। জরুরি অবস্থায় স্বামী অথবা দেবরকে সাথে নিয়ে যান। সেবামূল্যের জন্য কারো উপরে চাপ প্রয়োগ করেন না। কেউ দেয় কেউ দিতে পারেন না। তাদের মাধ্যমে জোছনার কাজের সুনাম আশেপাশে ছড়িয়ে যায়। সবাই বলে, হাতে গ্লোভস পরে হাসপাতালের মত ডেলিভারী করাতে পারে জোছনা বেগম। প্রসব সাম্ভাব্য সব মায়েদের নিয়ে প্রতি মাসে একটি পরিকল্পনা করেন আর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি স্বশরীরে বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন।

এক সময়কার দারিদ্র্যপীড়িত জোছনা স্বামীর উপর এখন আর নির্ভরশীল নয়। একসময় যে ঘরে আসবাবপত্র প্রায় কিছুই ছিল না, আজ সেখানে অনেক ফার্নিচার। ভবিষ্যতের কথা ভেবে সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে খুলেছেন ব্যাংক একাউন্ট। মেয়েদের পড়ালেখাসহ সকল ব্যয়ভার বহন করছেন। পরিবারের আয় রোজগারে স্বামীর পাশে দাঁড়ানোর বিষয়টি জোছনাকে করেছে গর্বিত এক নারী। রাতের বেলার ডেলিভারী গুলোতে তার স্বামী ও দেবর সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এর রয়েছে সমর্থন ও সহায়তা।

জোছনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনিরগাতি গ্রামের প্রসূতি সাবিনা আক্তার বলেন, ‘জোছনা আপা খুব ভালা-তানর লগে খোলা-মেলা কথা কওয়া যায়, গর্ভের সময় ৩ বার পরীক্ষা করাছইন, তানর ব্যবহার খুব ভালা। তাইন (জোছনা) আমরার বাড়িত আইন, খোঁজ-খবর নেইন। আমরা বিপদ-আপদে তাইনরেই বেশি কাছে পাই। মাজ রাইতে তাইন আমরার বাড়িত আইছইন, ভালা করিয়া ডেলিভারী করাইছইন,আমরা খুবই খুশি। তাই আমরা খুশি হইয়া ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা দিছি।’

‘জোছনা আপা খুব ভালা-তানর লগে খোলামেলা কথা কওন যায়’

ফটো: তাপস পাল/কেয়ার বাংলাদেশ

মাসুদা

স্থানীয় বাজারে একটা ছোট ফার্মেসী ও সেবা কেন্দ্র দিয়েছেন।

তিনি উপলব্ধি করলেন যে তার স্বামীর একার পক্ষে সংসার খরচ চালানো সম্ভব না।

বাবার মৃত্যুর পর মাসুদার (২৯) পরিবারে নেমে আসে নিদারুণ অনিশ্চয়তা। ২০০৪ সাল, মাসুদার তখনও এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়নি। বাবার মৃত্যুর পর অসচ্ছলতা দারিদ্র্যে রূপ নেয়। বাবার পরিবারে অভাব অনটনের ভেতরে বড় হয়েছেন, কিন্তু বাবাহারা পরিবারের দারিদ্র্য আর অনিশ্চয়তা সে অভাবের তুলনায় অনেক ভয়ঙ্কর ছিল। এমন অবস্থায় পড়াশোনা শেষ না হতেই মাসুদার বিয়ে হয়। স্বামীর সংসারেও অভাব, সংসার চালাতে হিমশিম খেতে থাকেন তার স্বামী। মাসুদা নিজে বিকল্প কোন আয়ের পথ খুঁজতে থাকেন। কিছুদিন পর ব্র্যাক স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানোর কাজ শুরু করেন মাসুদা। সেই সাথে বিভিন্ন এনজিওতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করা শুরু করেন। এইসব কাজ করে মাসে যৎসামান্য কিছু টাকা রোজগার করা শুরু করেন।

একটা সময়ে এসে মাসুদা উপলব্ধি করেন প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা ছাড়া আয় উন্নতি সম্ভব নয়। আবারও পড়াশুনা শুরুর উদ্দ্যেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ২০১২ সালে এসএসসি পাশ করে এইচএসসিতে ভর্তি হন। এর ভিতরে যখন তিনি ২০১৪ সালে কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ্ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ এর আওতায় প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণের খবর পান তখন কল্পনাতেও ভাবেননি যে, এই প্রশিক্ষণ চিরতরে তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

প্রাইভেট সিএসবিএ হিসেবে প্রশিক্ষণ শেষে মাসুদা নিজের ইউনিয়নের দুর্গম এলাকার পাঁচটি গ্রামের প্রায় ৮,০০০ জনসংখ্যাকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ধরনের সেবাপ্রদান শুরু করেন। প্রতিমাসে গড়ে ৫টা থেকে ৭টা ডেলিভারীর কাজ করেন। উপরন্তু একটি ঔষধের ফার্মেসী দিয়েছেন মথুরকান্দি বাজারে, সারাদিন গর্ভবতী নারী ও শিশুদের সেবা দিতে ঘুরে বেড়ান এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। বিকেলে বাজারের সেবাকেন্দ্রে এসে বসেন। মাসুদার স্বামী তার এই স্বাস্থ্য উদ্যোক্তার কাজকে এগিয়ে নিতে বাজারের সেবাকেন্দ্রের যাবতীয় কাজের দেকভাল করেন বিশেষ করে প্রয়োজনীয় ঔষধ উপকরন আনা থেকে রাতের ডেলিভারীতে সাথে যাওয়া বা প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেয়া পর্যন্ত। বাজারে এসে তিনি সেখানকার গ্রাম্য ডাক্তারদের সাথে কাজের একটি সুসম্পর্ক তৈরী করেছেন । ফলস্বরুপ গর্ভবতী নারীদের তারা এখন মাসুদার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর মহিলারা তাদের গর্ভকালীন বিভিন্ন সমস্যা শেয়ার করতে সংকোচ বোধ করেন না। এভাবেই বাড়তে থাকে মাসুদার দক্ষ স্বাস্থ্য সেবার কথা কর্ম এলাকার বিভিন্ন মানুষের মুখে মুখে। বর্তমানে প্রতি মাসে মাসুদার আয় ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা।

ফটো: তাপস পাল/কেয়ার বাংলাদেশ

প্রথমদিকে বলতে গেলে তেমন কারোরই সহযোগিতা পাননি মাসুদা। সেবাগ্রহীতারাও সেবামূল্য দিতে গড়িমসি করতো। সবাই ভাবতো তিনি দাতব্য কোন সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মী। কিন্তু ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সবাই বুঝতে পারে তিনি আসলে সরকারি বা দাতব্য কোন সংস্থার হয়ে কাজ করছেন না; তিনি একজন প্রাইভেট স্বাস্থ্য পরামর্শক বা প্রাইভেট সিএসবিএ, একজন স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা।

পরবর্তীকালে নিজের কর্মএলাকায় প্রচারের জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীদের সহযোগিতায় নিজের প্রচারের কাজ সম্পন্ন করেছেন। সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্সদের সাথে তৈরি হয়েছে সুন্দর সম্পর্ক, তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ নেন মাসুদা। স্বাভাবিক ডেলিভারী হবে না এমন জটিল মায়েদের সদর হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। সেখানে নিরাপদ মায়েদের প্রসবের ব্যবস্থা করেন আর এভাবে সরাসরি অবদান রাখছেন মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে।

২০১৬ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এইচএসসি পাশ করেন মাসুদা। সংসার চলে এখন তার রোজগারের টাকায়। নিজের টাকায় পুরাতন বাড়ীতে টিন দিয়ে নতুন করে তৈরী করেছেন। রাতের বেলা ডেলিভারীর ডাক পড়লে স্বামীকে সাথে নিয়ে যান। স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তায় মাসুদা তার স্বাস্থ্য উদ্যোক্তার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কর্মএলাকায় পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা আর সম্মান এতটাই বেড়েছে যে, বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের স্টান্ডিং কমিটির একজন সদস্য।

প্রাইভেট দক্ষ সেবাদানকারীদের মধ্যে তিনি গতানুগতিক প্রথার বাইরে গিয়ে স্থানীয় বাজারে সেবাকেন্দ্র খুলে বসেছেন।

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

সুজাতা

গৃহিনী থেকে ডাক্তারনী আপা।

প্রথমত তার স্বামী ছিল রক্ষণশীল, বাড়ীর বৌ বাহিরে গিয়ে কাজ করবে তা মেনে নিতে পারছিলোনা।

কেয়ার জিএসকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ইনিশিয়েটিভ এর আওতায় প্রাইভেট কমিউনিটি দক্ষ সেবাদানকারীর প্রশিক্ষণ নেয়া নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে গল্পগুলোর ভিন্নতা লক্ষণীয়। কেউ দারিদ্র্যের কারণে দিশেহারা তো কেউ স্বামী পরিত্যক্তা, আবার কেউবা বাল্যবিবাহের বলি হয়ে অল্পবয়সে হারিয়েছেন তার স্বামীকে। অনেকেরই সফল হয়ে ওঠার পিছনে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে রয়েছে স্বামীদের ভূমিকা। আবার এমনও কেউ আছেন দারিদ্র্যের পাশাপাশি যাদের ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা হয়ে এসেছে তাদের স্বামীদের রক্ষণশীল মনোভাব আর সুজাতার (২৬) ক্ষেত্রে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল!

২০০৮ সালে এইচএসসি পড়ার সময়ই সুজাতার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর উচ্চশিক্ষা বা আত্মকর্মসংস্থানের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। লেখাপড়ার চেয়ে ঘর-সংসার এর কাজ সামলানোই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তার উপর স্বামীর সুনির্দিষ্ট আয় না থাকায় অনেক হিসেব করেই সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে হতো। এসব সংকটের ভেতরও শ্বশুর-শ্বাশুড়ি নিয়ে স্বামীর সংসারে মানিয়ে নেন সুজাতা। স্বামীর বাড়ির এলাকার সবার কাছে ভদ্র এবং মিশুক বউ হিসেবে পরিচিতি হয়ে যান।

এমন সময় কেয়ার জিএসকে সিএইচডাব্লিউ উদ্যোগের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পেরে এই ভেবে আশ্বস্ত হন যে, হয়তো উচ্চশিক্ষা না থাকলেও নিজের মত করে একটা কিছু শুরু করতে পারবেন। স্বামীকে না জানিয়ে প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আবেদনপত্র জমা দেন। ২০১৬ সালে প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণের চতুর্থ ব্যাচে তিনি প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে মনোনীত হন। কিন্তু বাড়িতে চার বছরের ছোট বাচ্চাকে রেখে প্রশিক্ষণে যাওয়া নিয়ে সংকট তৈরি হয়; তিনি স্বামীকে রাজি করাতে ব্যর্থ হন। প্রথমে দমে গিয়েছিলেন কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেন, স্বামীকে রাজি করানোর জন্য শুভাকাঙ্খীদের শরণাপন্ন হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, শ্বশুর-শাশুড়ির সাহায্যে অবশেষে স্বামীকে বোঝাতে সক্ষম হন সুজাতা।

ছয় মাসের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সফল ভাবে শেষ করে নিজ এলাকায় ফিরে এসে কাজ শুরু করেন। প্রথম কয়েক মাস তার সেবাপ্রদানের হার এবং রোজগার কোনোটাই তেমন ভালো ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের কর্মপরিকল্পনা আর সকলের সহযোগিতায় সেবাগ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগ বাড়তে থাকে। আত্ম বিশ্বাসী সুজাতা অত্যন্ত মনযোগী হয়ে উঠেন নিজের সেবার মান উন্নয়নে আর নিয়মিত উঠান বৈঠক এবং প্রসব পরিকল্পনা সেশনগুলোতে

ফটো: তাপস পাল/কেয়ার বাংলাদেশ

গর্ভবতী মায়েদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যান। গ্রামের গর্ভবতী মায়েদের কাছে দক্ষ প্রসব সেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর চেষ্টা চালিয়ে যান। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সহায়তায় প্রচারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক ব্যানার ও সাইনবোর্ডের ব্যবস্থা করেন।

দিনে দিনে নিষ্ঠা আর পরিশ্রম দিয়ে সুজাতা গড়ে তুলেছেন নিজের কর্ম এলাকা। প্রতিদিন রুটিন মেনে এলাকা পরিদর্শনে যান, সম্ভাব্য ডেলিভারী হওয়া মায়েদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। শিশু ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যসচেতন করে তুলতে পরামর্শ দেন। দিনে দিনে রোজগারেও এসেছে পরিবর্তন। বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে দশ থেকে বারো হাজার টাকা রোজগার করছেন। তার রোজগারের পয়সা দিয়ে স্বামীর পরিবারের প্রায় ১০০,০০০ টাকার মত দেনা পরিশোধ করেছেন।

স্বামীর রোজগারের সাথে সুজাতার রোজগার মিলিয়ে বেশ স্বচ্ছলভাবেই চলছে সংসার। নিজের কষ্টার্জিত আয় থেকে সংসারের খরচ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ দিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয়ও করতে পারছেন। সুজাতা বলেন, "এলাকার বৌ হলেও শ্বশুরবাড়ির এলাকার সবাই আমাকে এখন 'ডাক্তারনী' নামেই চেনে। এই পরিচয় আমাকে গর্বিত করে, নিজেকে আরো আত্মবিশ্বাসী করে তোলে- নিজের এই আত্ম পরিচয়"। তার এই স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পেছনে শ্বশুর আর শাশুড়ির পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অবদান অনেক। তাদের সহায়তা আর উৎসাহে আজ একজন স্বাবলম্বী নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তিনি।

প্রতিদিনের কাজের সময়ে সংসার এবং সন্তানের দেখাশুনা শ্বশুর-শ্বাশুড়িই করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা গভীর রাতে জরুরি ডেলিভারী সেবাপ্রদানের সময় স্বামীর সহযোগিতা পান। বিশেষ করে দূর্গম গ্রামে যাওয়ার জন্যে নৌকা ঠিক করে দেয়া থেকে সাথে করে সেবাগ্রহীতার বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া, বাজার থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ উপকরন এনে দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে। উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করতে না পারা সুজাতা তার সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখেন।

সুজাতা নিজ রোজগার থেকে তার শ্বশুর বাড়ীর প্রায় দুই লাখ টাকার ঋণ শোধ করেছেন, স্বামী শ্বাশুড়ি এখন তাকে সব কাজে সহযোগীতা করে।

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

স্বপ্না

অসুস্থ নারীদের পাশে দাঁড়ানোই তার আনন্দ।

প্রসব ব্যাথায় কোন প্রসূতীর আর্তনাদ শুনে তার শ্বাশুড়ি গল্প করতো – আমাদের এলাকায় কোন ডাক্তার নেই, মানুষ এখানে কত অসহায়।

স্বপ্না আক্তারের (২৬) গল্পটা শুরু করা যাক গ্রামের অন্য এক নারীর সন্তান প্রসবের অভিজ্ঞতা দিয়ে। সফিরনের প্রসববেদনা শুরু হলে পরিবারের লোকেরা সাথে সাথে গ্রাম্য ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে; ডাক্তার এসে অক্সিটসিন ইঞ্জেকশন আর স্যালাইন দেয় কিন্তু ডেলিভারী হয় না। কমিউনিটি গ্রুপের বাবুল ভাই প্রাইভেট সিএসবিএ স্বপ্নাকে ফোন দেন। কিন্তু গ্রাম্য ধাত্রীরা বাঁধা দেয়, তারা স্বপ্নাকে আসতে নিষেধ করে। পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে স্বামী সজিব একটা ডিঙি নৌকা নিয়ে স্বপ্নাকে আনতে রওনা হয়। স্বপ্না এসে রোগীর পূর্বের গর্ভকালীন সমস্যা সম্পর্কে খোঁজ নেন। ব্লাড প্রেশার এবং অন্যান্য পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন বাচ্চার অবস্থান ঠিক নেই। তখন মাকে, অর্থাৎ সফিরনকে একটু কিছু খেতে পরামর্শ দেন। খাওয়ার পর একটু হাঁটতে বলেন। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক ডেলিভারী সম্পন্ন হয়। এরপর সফিরন স্বপ্নাকে ধর্মের বোন বানিয়ে বলেছেন, 'তুমিই আমারে বাঁচাইছো।' সেবামূল্য ছাড়াও স্বপ্নাকে বকশিশ দেয় ৫০০ টাকা।

২০১২ সালে স্বপ্না আক্তারের বিয়ে হয় দিরাই উপজেলার নগদীপুর গ্রামে। স্বামী আবুল কালাম মুদি দোকানে কাজ করেন। তার শ্বাশুড়ি এলাকায় গর্ভবতী মায়েদের ডেলিভারীর ব্যাথা উঠলে বলতেন, "আমাদের এলাকায় কোন ডাক্তার নাই, মানুষ এখানে কত অসহায়।' স্বপ্নাদের এলাকাটি দুর্গম, বর্ষায় চারিদিক পানি থৈ থৈ করে। অসুস্থ হলে বিনাচিকিৎসায় মরা ছাড়া উপায় নেই"। শ্বাশুড়ির কথা তাকে অনেক ভাবায়। পরিবারের সবার সম্মতিতে ২০১৫ সালে স্বপ্না আক্তার কেয়ার জিএসকে সিএইচডাব্লিউ উদ্যোগের চতুর্থ ব্যাচে প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষ করে কাজ শুরুর দিকে এলাকার কেউ তাকে চিনতো না; কারণ সে এই এলাকার বৌ। রেজিস্ট্রেশন করার সময় কেউ তথ্য দিতে চাইত না, সেবামূল্য দিতে চাইত না। এই অবস্থায় তার শ্বাশুড়ি গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করেন।

একদিন এক ঘটনা ঘটলো জগদল ইউনিয়নের সদস্য নূর আলম মেম্বারের স্ত্রীর ডেলিভারীর সময় পরিস্থিতি খারাপ হলে, তারা স্বপ্নাকে খবর দেয়। সে রেফার করে নিজেই সাথে যায় দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং নার্স ও ডাক্তারদের সহায়তায় নিরাপদে ডেলিভারী করায়। এরপর ইউনিয়ন পরিষদ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্বপ্নার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। নগদীপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি রফিক চৌধুরী বলেন, স্বপ্না তাদের এলাকায় আসার পরে তাদের কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতি মাসেই ১-২টি করে

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

ডেলিভারী করাচ্ছেন, প্রতিটি ডেলিভারীর জন্যে কমিউনিটি গ্রুপ এর ফান্ড থেকে স্বপ্নাকে ৩০০ টাকা করে দেয়া হয় আর সংশ্লিষ্ট পরিবার খুশি হয়ে যে যার মত সেবামূল্য পরিশোধ করে।

শুধু মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবাই নয়, পাশাপাশি বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা ও কিশোরীদের রক্ত স্বল্পতার জন্যে আয়রন বড়ি প্রদান সহ ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পরামর্শ দিচ্ছেন স্বপ্না। তাদের কাছে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী বিক্রি করছেন। এভাবেই এলাকায় বাড়ছে মানুষের স্বাস্থ্যসচেতনতা। মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী সেবামূল্য পরিশোধে উৎসাহিত বোধ করছে, সাথে সাথে স্বপ্নার রোজগারও বাড়ছে।

স্বপ্না আক্তারের প্রতি মাসে আয় হয় পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা। স্বপ্না নিজের আয়ের টাকায় তার শ্বশুর বাড়ীটিকে নতুন করে সংস্কার করেছেন। পরিবারের আয়ের মধ্যে নিজের আয়ের কিছু অংশ দিতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। কিন্তু তার আসল পরিতৃপ্তির উৎস এই কাজের আনন্দ: মানুষের বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো, পরামর্শ আর স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে মুমূর্ষু নারীদের জীবন বাঁচানো। তার শ্বাশুড়ি যে বলেছিলেন গ্রামে ডাক্তার নেই বলে অকালে অনেক নারীর মৃত্যু হয় সে অবস্থাটা সত্যিই পাল্টে দিয়ে গ্রামের মা ও শিশুদের দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পারছেন। এলাকায় সে এখন নিজের পরিচয়ে পরিচিত, স্বামী ও পরিবারের সব সদস্যদের সহায়তায় স্বপ্না এগিয়ে যাবে, টিকে থাকবেন একজন দক্ষ স্বাস্থ্য সেবাদানকারী হিসেবে দূর্গম হাওড়ের সেবাবঞ্চিত মানুষগুলোর জন্যে ।

তার সবচেয়ে বড় অর্জনের জায়গাটা হচ্ছে অনাকাঙ্খিত মাকে দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে বাঁচানো।

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

সুলতানা

যে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়েছিল!

এক পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে পরাজিত হয়।

শাল্লা উপজেলার ৩৫ বছর বয়সী সুলতানার স্বামী আব্দুল কুদ্দুস একজন সাধারণ কৃষক। দুই ছেলে আর দুই মেয়ে নিয়ে শাল্লা উপজেলার মেঘারকান্দা গ্রামে অভাব আর অনিশ্চয়তার ভেতর বসবাস ছিল তাদের। পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আশায় প্রাইভেট সিএসবিএ-র দ্বিতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করেন ২০১৪ সালে। কিন্তু প্রচন্ড দারিদ্র্যপীড়িত কর্মএলাকায় কাজ করে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না। সুলতানা ছিলেন পিছিয়ে পড়া প্রাইভেট সিএসবিএদের মধ্যে অন্যতম একজন।

প্রথমদিকে নৌকা নিয়ে দুর্গম গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেবা দিয়ে পর্যাপ্ত সেবামূল্য না পাওয়ায় তার যাতায়াত খরচই উঠতো না, বরং আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হওয়ায় তিনি কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এরপর তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যা হওয়ার জন্যে নির্বাচন করেন এবং হেরে যান। অতঃপর ব্র্যাক এনজিওতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু সেখানেও সুবিধা করতে পারেন না।

এরই মধ্যে ২০১৭ সালে বছরের শুরুতে মার্চ মাসের বন্যায় তার পরিবারের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। একের পর এক বিপর্যয়ে মানসিকভাবে একেবারেই ভেঙে পড়ার উপক্রম। এমনি সময় তিনি খেয়াল করলেন, গ্রামের মানুষ প্রসব করানোর পর তাকে পয়সা না দিলেও ঔষধের পয়সা ঠিকই দিচ্ছেন। আর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের জরুরি ঔষধের একটা চাহিদা রয়েছে যেমন: জ্বর, সর্দি, কাশি, ডায়রিয়া, অপুষ্টি ইত্যাদির ঔষধ। এসব ঔষধ কিনতে হলে অনেক দূরের বাজার পর্যন্ত যেতে হয়, যোগাযোগ সমস্যার জন্য যা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে এই দুর্গম এলাকায় সুলতানা একটা বড় ঔষধের বাজার আবিষ্কার করেন। এরপর শাল্লা বাজার থেকে তার সঞ্চয়ের ৫,০০০ টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ঔষধ কিনে বাড়িতে একটি ছোট স্টোর তৈরি করেন। চাহিদামত সেখান থেকে ঔষধ নিয়ে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করতে শুরু করেন। বাড়াতে থাকেন ঔষধের জোগান। ডেলিভারী সেবা এবং ঔষধ সরবরাহ মিলিয়ে উপার্জন বাড়তে শুরু করে।

বর্তমানে তার ৫০ হাজার টাকার বিভিন্ন ঔষধের একটা মজুদ রয়েছে। এই কাজে তার স্বামী তাকে সাহস এবং সহযোগিতা দিয়ে চলেছেন। এলাকায় চাহিদা থাকায় এসএমসির (সোসাল মার্কেটিং কোম্পানী) সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রি

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

শুরু করেছেন। বর্তমানে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ জন মা নিয়মিত জন্ম বিরতিকরণ পিল কিনে নিয়ে যায় তার ওষুধের স্টোর থেকে। আবার সুলতানা যখন গ্রাম পরিদর্শনে যায় তখন ব্যাগে করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন। প্রতি মাসেই পরিবার পরিকল্পনার স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে নিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করছেন গড়ে ৭-৮ জন মহিলাকে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডা. সুমন আর সিনিয়র স্টাফ নার্স এর সাথে তৈরি হয়েছে সুসম্পর্ক। জটিল মায়েদের হাসপাতালে বিপদকালীন সময়ে মা ও শিশুদেরকে সেখানে রেফার করনে।

বর্তমানে প্রতি মাসে সুলতানার আয় প্রায় ১৫,০০০ টাকা। প্রতিমাসে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন গর্ভবতী মাকে রেজিস্ট্রেশন এর আওতায় নিয়ে নিয়মিত সেবা দিচ্ছেন। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষাসহ (ডায়াবেটিস, রক্তচাপ ইত্যাদি) প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দিয়ে চলেছেন। কখনো কখনো প্রসবকালীন সেবা দিয়ে সেবামূল্য না পেলেও শাড়ি, কাপড় উপহার পান। এই উপহার গুলোকে তিনি যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছেন, তিনি বলেন, এসবের মধ্যে মানুষের ভালোবাসা রয়েছে'।

কেয়ার জিএসকে প্রশিক্ষণের উপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে সুলতানা নিজেকে ঠিকই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কয়েকদিন আগেই সহজে রান্নার জন্যে একটি গ্যাসের চুলা কিনেছেন ৯ হাজার টাকা খরচ করে, ১১ হাজার টাকায় কিনেছেন অনেক শখের একটি শোকেস। সুলতানা বলছিলেন," গ্যাসের চুলায় তাড়া তাড়ি রান্না করে কাজে বেরিয়ে পড়তে পারেন অনায়াসে। এখন এই কাজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি একধরনের অন্যরকমের আগ্রহ আর এই কঠিন হাওড়ের মধ্যে সেবা বঞ্চিত মানুষগুলোকে দিতে পারছি সেবা, তাই নিজেকে এখন ভাগ্যবান মনে হয়"। প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সফল হওয়া যায় তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সুলতানা।

যে সব সেবাগ্রহীতারা সেবা মূল্য দিতে পারে না, তারা শাড়ি, বিভিন্ন জিনিষ উপহার হিসেবে দেন, সুলতানা এগুলোকে সযত্নে সাজিয়ে রাখেন।

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

কুলসুম

জীবনের সব কিছু দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন।

একজন স্বামী পরিত্যক্তা অল্পবয়সী মেয়ে হয়ে এই কাজ করতে যে যৌন হয়রানীর, অনৈতিক প্রস্তাবের শিকার হয়েছেন।

কুলসুমের (২৪) বাবা ছিলেন গ্রামের মসজিদের ইমাম। সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামে এমন পরিবারের একজন মেয়ের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। ছোটবেলা থেকেই কুলসুম স্বপ্ন দেখতেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। কিন্তু সেই বাসনা পূরণ হবার আগেই বাবা জোর করে তার বিয়ে দিয়ে দেন এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পরপরই। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকলোভী স্বামী নানারকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। সবকিছু মুখবুজে সহ্য করে যাচ্ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত চাহিদা মাফিক যৌতুক না পেয়ে জোর করে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় স্বামী। তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে দোয়ারা বাজার উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের রসরাই গ্রামে বাবার বাড়িতে ঠাঁই হয় কুলসুমের।

তিনি উপলব্ধি করেন, স্বাবলম্বী হলে স্বামী তার উপর এমন নির্যাতন করতো না; কিংবা বাবার বাড়িতে বোঝা হয়েও থাকতে হত না। তখন থেকেই কিছু একটা কাজ খুঁজছিলেন। এরপর কেয়ার জিএসকে সিএইচডাব্লিউ প্রকল্পে প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রতিবন্ধকতা তবু পিছু ছাড়ে না। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে কাজ শুরু করে আবার শিকার হন পুরুষতান্ত্রিক শোষণের। অল্পবয়সে স্বামী পরিত্যক্তা হওয়াতে পুরুষদের কু-নজরে পড়ে যান। তার মোবাইল ফোনে আসতে থাকে বিরক্তিকর সব ফোন কল, যেখানে তাকে কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল মন্তব্য করা হত। অনেকে অনৈতিক প্রস্তাব দিতে থাকে। তাই সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি তার কাজের সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দেখা দেয়।

এমন দুর্দিনে তার পাশে এসে দাঁড়ায় ইউনিয়ন পরিষদ আর মাঠ পর্যায়ের সরকারের স্বাস্থ্য কর্মীরা। আর ঝুঁকি মোকাবেলায় সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তার মা মার্জিয়া বেগম। মা চাইতেন মেয়ে তার আর দশজনের মত দমে না গিয়ে নিজের চেষ্টায় স্বাবলম্বী হোক। কুলসুম জানান, 'মায়ের সহযোগিতা না পেলে প্রাইভেট সিএসবিএ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রথম দিকে মা নিজে আমার সাথে রোগীদের বাড়ি পর্যন্ত যেতেন; কখনও রাতে কোথাও বাচ্চা প্রসব করাতে গেলেও মা সাথে যেতেন।' এছাড়াও কুলসুম যখন সকাল আটটায় বের হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিকেল চারটা পর্যন্ত সেবা দেন তখন মা তার সন্তানের দেখাশোনা করেন।

এখন নিজের কাজের প্রয়োজনে কুলসুম মাঠপর্যায়ে একটি সুসংগঠিত মার্কেটিং নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেছেন। ধাত্রী, গ্রাম্য ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সাথে গড়ে তুলেছেন পেশাদারী সম্পর্ক। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের একদম মাঠ পর্যায়ের স্যাটেলাইট ও ইপিআই কেন্দ্রগুলোতে গর্ভবতী মায়েদের রেজিষ্ট্রেশন করে নিয়মিত প্রসবপূর্ব সেবা দিয়ে থাকেন।

আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সামাজিক মর্যাদা ফিরে পাওয়ার পর আবারো বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করেছেন কুলসুম। স্বামী প্রথমদিকে নিয়মিত বাইরে যাওয়া পছন্দ করতেন না, কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়াতে তিনি বাঁধা দিতে পারেননি। স্বামীকে বুঝিয়ে নিয়মিত কাজে বের হন কুলসুম। নিজ কর্ম এলাকায় গড়ে ৭-৮টি করে ডেলিভারী করাচ্ছেন, এছাড়াও অন্যান্য সেবা প্রদানের হার বাড়ছে প্রতি দিনই। স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হিসেবে সেবা প্রদানের মূল্য থেকে কুলসুমের মাসিক আয় এখন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা।

নিজের উর্পাজনের টাকায় কুলসুম কিনেছেন প্রায় পনের শতক জমি। সেই জমিতে নিজেই বাড়ি করবেন বলে ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলে নিয়মিত সঞ্চয় করছেন। এখন নিজের আয় থেকে প্রয়োজন মত মা বাবাকে সাহায্য করতে পারছে এবং নিজের ভালোমন্দের সিদ্ধান্ত এখন নিজেই নিয়ে থাকেন কুলসুম। পুরোনো দিনের কথা মনে করে কুলসুম বলেন, ‘সেসব দিনের যে কষ্ট, অনিশ্চয়তা আর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ছিল, তা কেটে গেছে অনেকাংশে, এখন আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। স্বামী সন্তান নিয়ে এখন সুখেই দিন কাটছে, আগের থেকে আরো বেশী করে কাজের মান উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে পারি ও বেশী সংখ্যক সেবাগ্রহীতাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি’।

একটা পর্যায়ে স্বাবলম্বী হলে আবার বিয়ে করে। দ্বিতীয় স্বামী বাহিরে গিয়ে কাজ করা পছন্দ না করলেও এক সময় তা মেনে নেয়।

ফটো: শহীদুল্লাহ আহমেদ/কেয়ার বাংলাদেশ

শিবলী

এগিয়ে যাওয়ার গল্প।

প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের সংসারে স্বচ্ছলতা ফেরানো নারীদের একজন শিবলী বেগম।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জের দুর্গম অঞ্চলগুলোয় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী না থাকায় প্রসবকালীন সময়ে এখানকার গর্ভবতী নারীদের পোহাতে হত অবর্ণনীয় দূর্ভোগ। মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু এবং মা ও শিশুর অপুষ্টি এখানে সর্বত্র। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেই দুর্গম অঞ্চলগুলোতে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরীর উদ্দ্যেশে কেয়ার জিএসকে সিএইচডাব্লিউ ইনিশিয়েটিভ নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে বদলাতে আরম্ভ করেছে এই এলাকার মানুষের জীবনের মান। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সহযোগিতায় পরিচালিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে শুধু সেবাগ্রহীতারাই লাভবান হয়েছে তা নয়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে অনেক নারীর। প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হয়ে বদলে গেছে অনেক নারীর জীবন। প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের সংসারে স্বচ্ছলতা ফেরানো নারীদের একজন শিবলী বেগম (৩১)।

দরিদ্র পরিবারের মেয়ে শিবলী বেগমের বিয়ে হয় ২০০৫ সালে দরগাপাশা ইউনিয়নের আব্দুল আলিমের সাথে। আব্দুল আলিম পেশায় একজন ডাকপিয়ন। সাময়িক এই চাকুরী একটা সময় শেষ হয়ে যায়। উপার্জন ভালো না থাকায় তার একার পক্ষে সংসারের খরচ চালানো কষ্টকর হয়ে দাড়ায়। টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকা শিবলী বেগম সিদ্ধান্ত নেন সংসারে স্বচ্ছলতা ফেরাতে তিনিও কাজ করবেন। এনজিওতে স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। একদিন ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে নোটিশ বোর্ডে প্রাইভেট সিএসবিএ প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি দেখতে পান। চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ করে জানতে পারেন বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত ছয়মাস মেয়াদি এই কোর্স। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আশায় আবেদনপত্র জমা দেন। ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি দ্বারা প্রাথমিক বাছাইয়ে টিকে যান। এরপর প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন শিবলী বেগম। প্রশিক্ষণ শেষে নিজ কর্মএলাকায় এসেই কাজ শুরু করেন।

মানুষ হিসেবে দারুণ সদালাপী শিবলী বেগম। এ কারণে তার সাথে সরকারি, বেসরকারি, ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য ও এলাকাবাসীর সাথে চমৎকার সম্পর্ক। দূর্গম হাওড়ের যোগাযোগ ও স্থানীয় ধাত্রীদের কিছু অসহযোগীতা ছাড়া কাজ শুরুর পর তেমন কোনো বড় বাঁধা পেরোতে হয়নি তাকে। পরিশ্রমী শিবলী

ফটো: ইমতিয়াজ পাভেল/কেয়ার বাংলাদেশ

বেগম মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দিয়েছেন প্রসূতি সেবা, মাসে ৭-৮ বাচ্চা প্রসব করিয়েছেন। এভাবে তার প্রতি মাসে ৭-৮ হাজার টাকা আয় হতে থাকে। এরই মাঝে তিনি গ্রহণ করেন কেয়ার বাংলাদেশের সহযোগিতায় সমন্বিত শিশুরোগ ব্যবস্থাপনা, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও এছাড়ায় সামাজিক ব্যবসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে একজন স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা হওয়ার সুদূরপ্রসারী চিন্তা। এই প্রশিক্ষণ শেষে স্বাস্থ্য সেবা এবং স্বাস্থ্যসুরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রি তার আয় আরো বাড়িয়ে দেয়। সম্প্রতি তার জমানো টাকা থেকে নিজের বাড়িতেই শুরু করেছেন ফার্মেসী। এই ব্যবসায় স্বামীও তাকে সহযোগিতা করেন। অনেক ঔষধ কোম্পানি এখন তার বাড়িতে এসে ঔষধ দিয়ে যায়, প্রয়োজনীয় অন্যান্য ঔষধ স্বামী জগন্নাথপুরের বড় ফার্মেসী থেকে নিয়ে আসেন। বাড়ীতে বাচ্চাদের দেখাশোনার পাশাপাশি রাতের বেলায় যখন ডেলিভারীর ডাক আসে তখন সাথে যায়, নৌকা, মটর সাইকেল যখন যা পাওয়া যায় তাই ব্যবস্থা করে দেন। এভাবে এক সময় তার আয় বেড়ে যায়।

নিজের বাড়িতে বসে গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিত দেখভাল করার পাশাপাশি শিশুদের সাধারণ চিকিৎসা দিয়ে থাকেন শিবলী বেগম। কমিউনিটি ক্লিনিকেও বাচ্চা প্রসব করান। এলাকার মানুষ তাকে 'ডাক্তার আপা' বলে ডাকে। শিবলী বলেন, 'আমার কিতা যে ভালো লাগে, খুব খুশি লাগে, মন ভইরা যায়, কিতা সম্মান করে।'

গর্ভবতী মায়েদের চেক আপের জন্য কিনেছেন টেবিল। এখন তার স্বপ্ন নিজের বাড়িতেই বানাবেন একটি ডেলিভারী রুম ও সেবা কেন্দ্র যেখানে ২৪ ঘন্টা তিনি দক্ষ সেবা দিয়ে যাবেন । নিজের ভাগ্য বদলের পাশাপাশি এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির দ্বার খুলে দেওয়ার জন্য কেয়ার বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সফল স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা এই নারী।

আমার কিতা যে ভালো লাগে, খুব খুশি লাগে, মন ভইরা যায়, মানুষ আমারে কিতা ভালা কথা কয়, কিতা সম্মান করে।

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

নুরুন নাহার

নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় আর প্রতিষ্ঠা পেতে প্রাইভেট কমিউনিটি দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী।

দেখতে সুন্দরী হওয়ায় অনেক আগে থেকেই বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করে। পরীক্ষার কিছুদিন আগে ঢাকায় গার্মেন্টসে কাজ করা পাত্রের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে।

উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে ২০১০ সালে এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সুনামগঞ্জের বালিজুড়ি ইউনিয়নের দরিদ্র পরিবারের মেধাবী মেয়ে নুরুন নাহার (২২)। দেখতে সুন্দরী হওয়ায় অনেক আগে থেকেই বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করে। পরীক্ষার কিছুদিন আগে ঢাকায় গার্মেন্টসে কাজ করা পাত্রের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। আট সন্তানের পরিবারে গরীব বাবা এটাকে লোভনীয় প্রস্তাব মনে করে নুরুন নাহারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করেই বিয়ে দিয়ে দেন।

নুরুন নাহার আরো বড় ধাক্কা খায় যখন বিয়ের মাত্র এক বছরের মাথায় জানতে পারেন স্বামীর আরো একজন স্ত্রী রয়েছে। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে গর্ভবতী অবস্থায় বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন নুরুন নাহার। কিভাবে এই দুঃসময় পার করবেন! তবে বুঝতে পেরেছিলেন যে কারো উপরে বোঝা হয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজে রোজগার করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তবেই তার দুঃখ ঘুচতে পারে।

এর মধ্যেই তার কোল জুড়ে আসে কন্যা সন্তান। সন্তান জন্মের পর নুরুন নাহার প্রথমে ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রে কাজ শুরু করেন। এরই সাথে স্থানীয় একটি এনজিওতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে পুষ্টি বিষয়ে কাজ করেন। এই কাজটি করতে গিয়ে দুর্গম এলাকার মা ও শিশুদের জন্য আরো বেশি স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ইচ্ছে তৈরি হয়। আরো বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারলে তবেই মানুষের সেবায় ভূমিকা রাখতে পারবেন। কেয়ার বাংলাদেশ যেন তার মনের কথা শুনতে পেয়ে এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি মেটাতে সিএইচডাব্লিউ প্রকল্প শুরু করে। নুরুন নাহার ২০১৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদে বিজ্ঞপ্তি দেখে প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারেন। প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হলে পাঁচ বছর বয়সী মেয়েকে নিজের মায়ের কাছে রেখে জামালপুর সদর হাসপাতালের নার্সিং ইনিস্টিটিউটে ছয়মাসের প্রশিক্ষণ নিতে চলে যান।

প্রশিক্ষণ শেষে এলাকায় ফিরে কাজ শুরু করেই তাকে মুখোমুখি হতে হয় আরেক পরীক্ষার। স্বামীকে ছেড়ে আসার কারণে সমাজের লোক তাকে ভালো চোখে দেখে না, তাই তার কাছ থেকে সেবা নিতে চায় না। নাছোড়বান্দা নুরুন নাহার গর্ভবতী নারীদের তালিকা তৈরি করে নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকলেন সেসব বাড়িতে। নিজের প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ আর কমিউনিটি ক্লিনিকের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করলেন। তাদের সহায়তায় বিভিন্ন ফোরামে দক্ষ স্বাস্থ্য সেবার গুরুত্ব বোঝাতে শুরু করলেন। এখান

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

থেকে তার আর একটি কিছুদিন যেতেই গর্ভবতী মায়েরা তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেন। তারপর থেকে প্রসূতি সেবা, শিশু স্বাস্থ্য সেবা, জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও নারীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে এলাকার মানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন প্রিয়মুখ, বেড়েছে সমাজে গ্রহনযোগ্যতা। পাশাপাশি কমিউনিটি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় পাচ্ছেন বাড়তি সামাজিক নিরাপত্তা। আয় বাড়াতে তিনি তার এলাকার দুটি স্কুলে কিশোরী বয়সী ছাত্রীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা এবং ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিক্রি করছেন।

এখন মাসে সাত থেকে আট হাজার টাকা আয় করেন নুরুন নাহার। ধীরে ধীরে বাড়ছে তার সেবাগ্রহীতার পরিধি। তার এলাকার প্রায় শতভাগ গর্ভবতী মাকে তিনি রেজিস্ট্রেশনের আওতায় নিয়ে এসেছেন। কমিউনিটি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় প্রত্যেক মায়েদের জন্য নিশ্চিত করছেন প্রসব পরিকল্পনা।

নিজের আয় থেকে এখন বাবাকে সহযোগিতা করছেন নুরুন নাহার। কিনেছেন সেলাই মেশিন, সময় পেলেই সেখানে কাপড়ের সাথে সেলাই করে ফেলেন নিজের দুঃখগুলো। স্বাবলম্বী হওয়াতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও বেড়েছে। অতীত নিয়ে এখন আর আফসোস করেন না। কেয়ার বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন কিছুটা পূরণ হলেও চাপা পড়ে থাকা আরো একটা স্বপ্নকে প্রাণ দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই সফল স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা।

নিজেকে আরো দক্ষ ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবাদানকারী হিসেবে গড়ে তুলতে আর উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণে আবার শুরু করেছেন লেখাপড়া। সাথে মেয়েকেও পড়াচ্ছেন, তার স্বপ্ন মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে এমনভাবে বড় করবেন যাতে তাকে কখনও অন্যের উপর নির্ভর করতে না হয়, যেন নিজেই নিজের যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারে।

নিজের আয় থেকে এখন বাবাকে সহযোগিতা করছেন নুরুন নাহার। কিনেছেন সেলাই মেশিন, সময় পেলেই সেখানে কাপড়ের সাথে সেলাই করে ফেলেন নিজের দুঃখগুলো।

ফটো: জান্নাতুল মাওয়া/কেয়ার বাংলাদেশ

চম্পা

দূর্গম শাল্লা উপজেলায় নিজের আনন্দেই সেবা দিয়ে চলেছেন।

মোটামুটি একটা স্বচ্ছল পরিবারে বিয়ে হয়েও আরো সম্মানজনক এবং ভালো উপার্জনের উপায় খুঁজছিলেন তিনি।

কিশোরী চম্পার (২৫) স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে লেখা পড়া করে কাজ করবেন। কিন্তু সুনামগঞ্জের দারিদ্রকবলিত প্রতিকূল পরিবেশে বাল্যবিবাহের হার এতই বেশী যে গ্রামের মেয়েদের স্বনির্ভরতার ইচ্ছা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব। লেখাপড়ায় সমাপ্তি টেনে অল্পবয়সেই সংসার জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হন তিনি। তবুও দৃঢ় মনোবলের জোরে সম্ভাব্য সকল উপায় কাজে লাগিয়ে প্রাইভেট সিএসবিএ হয়ে ডাক্তার হওয়ার সাধ কিছুটা হলেও মেটাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

বিয়ের পর শাল্লা উপজেলার হাওড় বেষ্টিত প্রত্যন্ত আটগাঁও ইউনিয়নের মামুদনগর গ্রামে বসবাস করতেন চম্পা। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারে বিয়ে হয় তার, স্বামী ঔষধের ব্যবসা করেন। বিয়ের পর এলাকায় একটি ব্র্যাক স্কুল পরিচালনা করে সামান্য কিছু উপার্জন করতেন চম্পা। সংসারে এটাই ছিল তার একমাত্র অর্থনৈতিক অবদান। আরো সম্মানজনক এবং ভালো উপার্জনের উপায় খুঁজছিলেন তিনি। এমন সময়ে ২০১৩ সালে এলাকার মহিলা ইউপি সদস্যার কাছে কেয়ার জিএসকে পরিচালিত প্রাইভেট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারেন; দেরী না করেই আবেদনপত্র জমা দেন। কিন্তু এই সুযোগও হাতছাড়া হয়ে যায়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের পর নিয়োগবোর্ড কতৃক নির্বাচিত হয়েও প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেন না; কারণ তিনি ততদিনে আবারও গর্ভধারণ করেছেন। ২০১৪ সালে পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি পেয়ে আবেদন করেন। এবারও নির্বাচিত হন এবং ৬ মাসের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

তিনি এখন শাল্লা উপজেলার হাওড় বেষ্টিত প্রত্যন্ত আটগাঁও ইউনিয়নের চিকিৎসাবঞ্চিত গর্ভবতী নারী ও শিশুদের নিয়মিত সেবা প্রদান করছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছেলেমেয়েদের সকালের খাবার খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে প্রতিদিন কাজে বেরিয়ে যান। প্রতিদিন কাজ শুরুর আগে স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে কর্মএলাকা ও সম্ভাব্য সেবাপ্রদানের বাড়ি নির্ধারণ করেন। তারপর নির্ধারিত গ্রামে গিয়ে উঠান বৈঠকে অংশগ্রহন করেন। গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা, শিশুদের সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করেন। যারা উঠান বৈঠকে আসতে পারেন না তাদের বাড়িতে গিয়ে সেবা প্রদান করেন।

নিজের প্রাইভেট সিএসবিএ হয়ে ওঠার গল্পের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মানুষের উপকার করতে ভালো লাগে তাই যখন প্রাইভেট সিএসবিএ সর্ম্পকে জানতে পারি তখন থেকেই মনস্থির করি, "আমি প্রাইভেট সিএসবিএ হবো। তাছাড়া নিজে উপার্জন করে

ফটো: মুরাদ হোসেন তপু/কেয়ার বাংলাদেশ

পরিবারে আর্থিক সহযোগিতা ও ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করাও আমার আরেকটি ইচ্ছা। সে স্বপ্ন পূরণের জন্যই সব কষ্ট মেনে নিয়ে করে চলেছি। এই দুর্গম অঞ্চলে প্রাইভেট সিএসবিএ হিসেবে কাজ করার সবচেয়ে বড় সমস্যা যোগাযোগ। রাস্তা-ঘাট এবং যানবাহনের অপ্রতুলতার কারণে জরুরী যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। অনেকেই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে জরুরী প্রসবের সময় গ্রাম্য ধাত্রীদের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া গ্রামের অস্বচ্ছল সাধারণ মানুষ সবক্ষেত্রে সেবামূল্যও দিতে পারে না। এসব সমস্যা উপেক্ষা করে এলাকার মানুষের সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।”

এলাকার মানুষ এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চম্পার গ্রহনযোগ্যতা এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি স্বামীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বড় করতে সহযোগিতা করতে পেরেছেন চম্পা। পরিকল্পনা করছেন আরো বেশী দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং বাড়িতে সকল ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুবিধাসহ একটি স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র নির্মাণ করেছেন সাথে একটি ছোট ফার্মেসী, তার স্বামী এখন এখানে নিয়মিত বসেন। এটি নির্মাণ করাতে দিন রাত ২৪ ঘন্টাই জরুরী প্রসব সেবা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পারছেন তিনি। পরিকল্পনা ও চাহিদা অনুযায়ী চম্পা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গ্রাম থেকে গ্রামে বাড়ী বাড়ী ঘুরে মা শিশু সহ অন্যান্য সেবা গ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করেন। প্রশিক্ষন থেকে প্রাপ্ত দক্ষতাগুলোকে আরো মান সম্মত ভাবে প্রদান করতে তার প্রাণান্ত চেষ্টার শেষ নেই তাই সরকারী দক্ষ সেবাদানকারীদের সাথে গড়ে তুলেছেন সখ্যতা ।

সে স্বপ্ন পূরণের জন্যই সব কষ্ট মেনে নিয়ে চলেছি। এই দুর্গম অঞ্চলে প্রাইভেট সিএসবিএ হিসেবে কাজ করার সবচেয়ে বড় সমস্যা যোগাযোগ।

ফটো: আসাফুজ্জামান ক্যাপটেইন/কেয়ার বাংলাদেশ